সহজ পাঠ

চতুর্থ ভাগ

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
কলিকাতা

সম্পাদক শ্রীক্ষিতীশ রায়
শান্তিনিকেতন। বীরভূম

প্রকাশ পৌষ ১৩৪৭
সংস্করণ ভাদ্র ১৩৫০
পুনর্মুদ্রণ ১৩৫২, ১৩৫৫, ১৩৫৭, ১৩৫৮, ১৩৬১, ১৩৬৪
১৩৬৭, ১৩৬৮, ১৩৬৯, ১৩৭১, ১৩৭২, ১৩৭৬, ১৩৭৯, ১৩৮২, ১৩৮৪
বৈশাখ ১৩৮৭ : ১৯০২ শক

প্রকাশক রণজিৎ রায়
বিশ্বভারতী। ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড। কলিকাতা ১৭
মুদ্রক শ্রীসিদ্ধার্থ মিত্র
বোধি প্রেস। ৫ শঙ্কর ঘোষ লেন। কলিকাতা ৬

সূচীপত্র

গান

আমি ভয় করব না, ভয় করব না ॥
দু-বেলা মরার আগে মরব না, ভাই, মরব না ॥

তরীখানা বাইতে গেলে মাঝে মাঝে তুফান মেলে ;
তাই ব'লে হাল ছেড়ে দিয়ে কান্নাকাটি ধরব না ॥

শক্ত যা তাই সাধতে হবে, মাথা তুলে রইব ভবে,
সহজ পথে চলব ভেবে পাঁকের 'পরে পড়ব না ॥

ধর্ম আমার মাথায় রেখে চলব সিধে রাস্তা দেখে,
বিপদ যদি এসে পড়ে ঘরের কোণে সরব না ॥

কচ্ছপের কাণ্ড

এক সরোবর। তাতে অনেক দিন ধ'রে বাস করছিল দুটো হাঁস আর একটা কচ্ছপ। হাঁস-দুটোর সঙ্গে কচ্ছপের ছিল খুব ভাব। তিন বন্ধু পরম সুখে আছে। হাঁস-দুটি সারাদিন সাঁতার কাটে, টুপ্ টুপ্ ক'রে ডুব দেয়, গুগলি খায়, ঝট্পট্ ক'রে পাখা ঝাড়ে। কখনো বা পাড়ে উঠে পিঠে ঠোঁট গুঁজে ব'সে ব'সে রোদ পোহায়। কচ্ছপও তখন উঠে এসে তাদের কাছে বসে। তিন বন্ধুতে গল্প শুরু হয়।

কোনো কোনো দিন হাঁস-দুটো ভোরবেলা কোথায় উড়ে চ'লে যায়। কচ্ছপ সেদিন একা-একা মনমরা হয়ে থাকে। সন্ধ্যার সময় হাঁসেরা ফিরে এলে সে আবার চাঙ্গা হয়ে ওঠে।

হাঁসেরা বলে, "এই-যে বন্ধু!"

কচ্ছপ বলে, "বাঁচালে বন্ধু, সারাদিন একা-একা, একেবারে হাঁপিয়ে পড়েছিলাম। বাবা! কথা না ব'লে লোকে থাকতে পারে কখনো!"

তার পর হাঁসেরা গল্প বলে— কত বন জঙ্গল পেরিয়ে, কত মাঠের পর মাঠ, গ্রামের পর গ্রাম ছাড়িয়ে, তারা গিয়েছিল কোন্-এক সরোবরে। সেখানে হাজারে হাজারে পদ্ম ফুটে রয়েছে। ঝাঁকে ঝাঁকে সোনালী রঙের ছোটো ছোটো মাছ সব ঘুরে বেড়াচ্ছে। কচ্ছপ অবাক হয়ে শোনে। তারপর গভীর রাতে যে যার বাসায় ফিরে ঘুমিয়ে পড়ে।

একদিন সন্ধ্যার পরে তিন বন্ধুতে মিলে গল্প করছে। বেশ জ'মে উঠেছে, হঠাৎ চাপা গলায় কচ্ছপ বললে, "চুপ।"

হাঁসেরা বললে, "কেন, কী হল?"

কচ্ছপ বললে, "শুনলে না?"

হাঁসেরা বললে, "কই, আমরা তো কিছু শুনি নি।"

কচ্ছপ বললে, "পাড়ে লোক এসেছে।"

গলার আওয়াজ শুনে হাঁসেরা বুঝল, কচ্ছপ ভয় পেয়েছে। বললে, "এলই বা লোক, তাতে এত ভয় পাচ্ছ কেন?"

কচ্ছপ বললে, "ভয় কি আর সাধে পাচ্ছি? এরা জেলে। আমি স্পষ্টই শুনতে পেয়েছি, হিংসুটেগুলো কাল সকালে জাল ফেলার মতলব আঁটছে। আমার একটা উপায় করো, ভাই।"

কচ্ছপ প্রায় কেঁদে ফেলে আর-কি। হাঁসেরা বললে, "তুমি এমন ঘাবড়াচ্ছ কেন বলো দেখি। কোথাকার কে এসেছে তার ঠিক নেই। তুমি আগে থেকেই ভয়ে মরছ। আগে দেখা যাক, লোকগুলো সত্যি সত্যি জেলে কি না। তার পর ভেবেচিন্তে একটা উপায় ঠিক করা যাবে'খন। তার জন্য এত ভাবনা কিসের?"

কচ্ছপ বললে, "দোহাই বন্ধু, দেখাদেখির কথা আর বোলো না। লোকগুলো যে জেলে তা হলপ ক'রে বলতে পারি। আমি ওদের কথা বুঝতে পারি। আজ রাত্রেই যদি আমার একটা গতি না করো তা হলে কাল আর আমায় দেখতে পাবে না। একটু বেলা হলেই জেলেরা জাল ফেলবে, আর ঐ যদ্‌ভবিষ্যের মতো আমাকেও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মরতে হবে।"

হাঁসেরা বললে, "কিরকম? যদ্‌ভবিষ্যটা আবার কে?"

কচ্ছপ বললে, "সে কী! যদ্‌ভবিষ্যের কথা শোন নি?"

হাঁসেরা বললে, "কই, শুনেছি ব'লে মনে হচ্ছে না তো।"

কচ্ছপ বললে, "শোনো তা হলে। অনেকদিন আগেকার কথা। তোমরা তখনো এখানে আস নি। এই সরোবরেই তিনটে মাছ থাকত। একজনের নাম অনাগতবিধাতা, একজনের নাম প্রত্যুৎপন্নমতি, আর-একজনের নাম যদ্‌ভবিষ্য। তারা অনেক দিন ধ'রে এখানে বেশ সুখেই বাস করত। শেষে একদিন জনকতক জেলে এসে উপস্থিত। ঐ-যে দেখছ সরোবরের ঈশান কোণের বটগাছটা, ওরই নীচে তারা আড্ডা গাড়ল। তখন শীতকাল। জেলেরা অনেক রাত পর্যন্ত ধুনি জেলে ব'সে ব'সে গল্পগুজব করল। মাছ তিনটি তাদের কথা শুনে বেশ বুঝতে পারল, তারা পরের দিন সকালেই জাল ফেলবে। অনাগতবিধাতা তখুনি গেল পালিয়ে।

"প্রত্যুৎপন্নমতি বললে, 'কে না কে এসেছে তার ঠিক নেই। জেলে তো না-ও হতে পারে। ভাসা ভাসা একটা কথা শুনে এত দিনের বাড়িঘর ফেলে কোথায় গিয়ে

ঘুরে মরব ! আমার বাপু, ও-সব পোষাবে না। আর যদিই বা জেলে হয়, তা হলেও এখন থেকে ছটফট করে কি লাভ, বুদ্ধি একটা উপস্থিতমত বেরিয়ে পড়বেই। আমি কোথাও যাচ্ছি নে।'

"যদ্‌ভবিষ্য বললে, 'আমিও না, আর যাবই বা কেন ! যা হবার তা গেলেও হবে, না গেলেও হবে। আর যা হবার নয়, তা গেলেও হবে না, না গেলেও হবে না। তবে গিয়ে লাভটা কী ! আমিও যাচ্ছি না'।"

হাঁসেরা বললে, "তার পর ?"

কচ্ছপ বললে, "তার পর আর কী, পরের দিন জেলেরা জাল ফেলল, আর ঐ প্রত্যুৎপন্নমতি ও যদ্‌ভবিষ্য দুজনেই ধরা পড়ল। প্রত্যুৎপন্নমতি ছিল বেজায় চালাক। সে ধরা পড়েই একদম মটকা মেরে মড়ার মতো প'ড়ে রইল। বোকা জেলেগুলো ভাবল, মাছটা ম'রেই গেছে। এই না ভেবে যেই তারা তাকে জাল থেকে খুলে একটু সরিয়ে রেখেছে, অমনি সে এক লাফে জলে প'ড়ে এক ডুবে একেবারে সরোবরের তলায় গিয়ে হাজির। জেলেরা তখন যদ্‌ভবিষ্যকে শক্ত ক'রে বেঁধে নিয়ে চলে গেল। এইজন্যেই বলছিলাম ভাই, আজ রাত্রের মধ্যেই আমার একটা উপায় ক'রে দাও, নইলে আমার ঐ যদ্‌ভবিষ্যের মতো দশা হবে।"

হাঁসেরা বললে, "তাই তো বন্ধু। অন্য কোনো সরোবরে যাওয়া ছাড়া তো উপায়ও দেখছি না। কিন্তু যাবে কী ক'রে ? ডাঙাপথে গেলে অর্ধেক পথ যেতে না যেতে ভোর হয়ে যাবে। তোমায় লোকে দেখতে পেলে ধ'রে নিয়ে গিয়ে খেয়ে ফেলবে। আর, দেখতে তো পাবেই। এই পথে সব সময়েই লোক চলাচল করে। অথচ, ডাঙাপথে ছাড়া তুমি যেতেও তো পারবে না।"

কচ্ছপ বললে, "সে আমি জানি, বন্ধু। সেইজন্যে ভেবে-ভেবে আমি একটা বুদ্ধি ঠাউরেছি।"

হাঁসেরা বললে, "কী বলো দেখি।"

কচ্ছপ বললে, "বুদ্ধিটা খুবই সোজা। একটা কাঠের টুকরোর মাঝখানে আমি কামড়ে ধরব, আর তোমরা দুজনে তার দু দিকে কামড়ে ধ'রে উড়ে যাবে।"

হাঁসেরা বললে, "খাসা বুদ্ধি বের করেছ, বন্ধু। তা হলে কাল ভোরেই বেরোনো যাবে। জেলেরা উঠতে না উঠতেই আমরা সরে পড়ব।"

কচ্ছপ বললে, "আচ্ছা।"

পরদিন ভোরবেলা কচ্ছপকে নিয়ে হাঁসেরা উড়ে চলল। কিছু দূর যেতে না যেতেই একদল রাখাল তাদের দেখে চেঁচিয়ে উঠল, "ওরে দেখ্ দেখ্, কী মজার কাণ্ড! দেখেছিস হাঁস-দুটো কেমন ক'রে কচ্ছপটাকে নিয়ে যাচ্ছে।"

হাঁসেরা উড়ে চলেছে, আর রাখালেরাও তাদের পিছন পিছন হাততালি দিতে দিতে আর চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটছে। তাদের মধ্যে একজন ব'লে উঠল, "কচ্ছপটা যদি প'ড়ে যায় ভাই, তা হলে এখানেই রান্না ক'রে ভোজ লাগিয়ে দিই।"

আর-একজন বললে, "দূর, তা কেন? বেশ মোটাসোটা কচ্ছপটা, বাড়ি নিয়ে যাব। তার পর সবাই মিলে খাব।"

অন্য একজন বললে, "না ভাই, তার চেয়ে ঐ পুকুরটার পাড়ে গিয়ে রান্নাবান্না করা যাবে। কচ্ছপের মাংস দিয়ে দিব্যি চড়িভাতি হবে।"

এ-সব কথা শুনে কচ্ছপটা রাগে আগুন হয়ে চেঁচিয়ে উঠল, "ছাই"— বোধ হয় বলতে গিয়েছিল, "ছাই খা বেটারা।" কিন্তু, অত কথা বলার ফুরসত পেল না। 'ছাই' বলতে না বলতেই ধুপ ক'রে প'ড়ে গেল। তখন রাখাল ছেলেদের আনন্দ দেখে কে।

কুঁড়েমি

"সময় চলেই যায়"—
নিত্য এ নালিশে
উদ্‌বেগে ছিল ভুপু
মাথা রেখে বালিশে।
কব্‌জির ঘড়িটার
উপরেই সন্দ,
একদম ক'রে দিল
দম তার বন্ধ—
সময় নড়ে না আর,
হাতে বাঁধা খালি সে ;
ভুপুরাম অবিরাম
বিশ্রামশালী সে।
ঝাঁ-ঝাঁ করে রোদ্দুর,
তবু ভোর পাঁচটায়
ঘড়ি করে ইঙ্গিত—
ডালাটার কাঁচটায়।
রাত বুঝি ঝক্‌ঝকে
কুঁড়েমির পালিশে।
বিছানায় প'ড়ে তাই
দেয় হাততালি সে।

উদ্ভিদ-রাজ্য

আমরা যে প্রাণীজগতে বাস করি তার এক ভাগ জন্তুর, এক ভাগ উদ্ভিদের। এদের দুই পৃথক কোঠায় ফেললেও, এক জায়গায় এরা সমান, উভয়েই এরা প্রাণী। উদ্ভিদ চলে না এবং কথা বলে না ব'লে এই সত্য আমাদের কাছে স্পষ্ট হয় না, আমরা তাদের জীব পদবী দিতে ভুলে যাই।

এ কথা সকলেরই জানা আছে, গাছপালাদের আমাদেরই মতো আহার ক'রে বাঁচতে হয়; খাদ্য জোটাতে না পারলেই তারা মারা পড়ে। যাদের প্রাণ আছে তাদের বৃদ্ধিও আছে, ও শেষ আছে মৃত্যুতে। গাছপালার মধ্যে এক দল আছে যাদের আয়ু কয়েক মাসের বেশি নয়। আবার এমন গাছ দেখা যায় যারা হাজার দু হাজার বছর বাঁচে।

আলাদা আলাদা ক'রে ধরলে, জন্তুরা প্রত্যেকে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বাঁচে, তার পর মরে। কিন্তু, তাদের সন্তান-সন্ততিদের মধ্য দিয়ে যে প্রাণধারা ব'য়ে যায় তার আর অন্ত পাওয়া যায় না। গাছপালারাও ফুল-ফল-বীজের সাহায্যে আপন বংশকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, মরতে দিচ্ছে না। ২৪।৯।৫৯

কিন্তু, বাঁচবার ধরনে তফাত দেখি জন্তুর সঙ্গে গাছপালার। বেশির ভাগ জন্তুই চলাফেরা ক'রে আহার সংগ্রহ করে, অধিকাংশ গাছ তা করে না। ভাঙার গাছ দেয় মাটির নীচে শিকড় চালিয়ে। কেউ-বা দেয় বহু দূরে, কেউ-বা দেয় উপরে উপরে। আহার জোটাতে জন্তুরা পায় বাধা, গাছেদেরও বাধা ঘটে। মাটির নীচে যেখানে নুড়ি-পাথর আছে, দেয় তারা পথ আটকে। আশপাশ থেকে অন্য গাছের শিকড় এসে ঠেলাঠেলি করে, আবার আহারের ভাগ নিয়েও পাল্লা দিতে থাকে। কিন্তু, শিকড় সহজে দমতে চায় না। সুবিধে খোঁজবার জন্য আঁকাবাঁকা পথ নেয়, কখনো যায় পাশের দিকে, কখনো ওঠে উপরে, কখনো নামে গভীরে।

একমাত্র মাটির ভাণ্ডারেই যে গাছের রসদ জমা থাকে তা নয়। গাছ তার প্রধান প্রাণপদার্থ জোগাড় করে হাওয়া থেকে। আর, তার চাই আলো। সেজন্য

গাছের ডালে পাতায় কী কাড়াকাড়ি। বীজ হতে অঙ্কুর মাটি ফুঁড়ে উপরে উঠে প্রথমেই দেয় আলোর দিকে পাতা মেলে। যে দিকে ছায়া, আলো কম, সে দিকে গাছ কিছুতেই ডাল বা পাতা বের করতে চায় না। গাছের ডাল বা পাতা সর্বদাই ছড়িয়ে পড়তে চায়, চার দিকে যতটা পারে আলো হাওয়া ধরবার জন্যে।

লজ্জাবতী লতা

গাছের এই যে বাঁচবার চেষ্টা, আহার জোগাড়ের জন্য এই যে নড়াচড়া—তা অনেক সময় আমাদের চোখে পড়ে না। কিন্তু, বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন, গাছ নির্জীব আড়ষ্ট জিনিস নয়, তার মধ্যে বাঁচবার চেষ্টা সব সময়েই কাজ করছে।

কোনো কোনো গাছের মধ্যে এই নড়াচড়া খালি চোখেই দেখতে পাওয়া যায়। লজ্জাবতী লতায় একটু জোরে নিশ্বাস ফেললেই তার পাতা মুড়ে যায়, বোঁটাটি নীচের দিকে নুয়ে পড়ে। আবার কিছুক্ষণ পরে আপনা থেকেই পাতা মেলে দিয়ে বোঁটাটি সোজা হয়ে দাঁড়ায়। তেঁতুল, আমলকী, শিরীষ, বাবলা ও এই জাতীয় আরো কোনো কোনো গাছ রাত্রিতে পাতা বুজিয়ে দেয়। শালুক ফুল দিনের বেলায় পাপড়ি বুজিয়ে দেয়, আর রাত্রি হ'লে মেলে। পদ্মের পাপড়ির ব্যবহার ঠিক তার উল্‌টো— দিনে তা ছড়িয়ে পড়ে, রাত্রে যায় গুটিয়ে।

গাছের পাতায় একরকম সবুজ পদার্থ আছে, জন্তুর তা নেই। গাছে ও জন্তুতে এই হল প্রধান তফাত্। অনেক গাছের ডাল ও গুঁড়ির ছালের রঙও সবুজ। মনসা-জাতীয় গাছের পাতা থাকে না, কিন্তু এদের আগাগোড়া সব দেহটাই সবুজ।

এই সবুজ পদার্থের গুণেই উদ্ভিদ বেঁচে আছে।

গাছের খাদ্য তৈরি হয় গাছের পাতায়। গাছ মাটি থেকে যে খাবার টেনে নেয় সে-সব জিনিস কাঁচা মাল—অর্থাৎ সেগুলোর রূপান্তর ঘটিয়ে তবেই তার ব্যবহার চলে। এই কাঁচা মালকে আলোর সাহায্যে খাদ্যে পরিণত ক'রে দেবার কাজ করে গাছের পাতা। পাতার সবুজ পদার্থ সূর্যকিরণ থেকে শক্তি সঞ্চয় ক'রে খাবার-পরিপাকের সাহায্য করে।

মনসা গাছ

জীবজগতের প্রাণ রক্ষা করছে উদ্ভিদ। উদ্ভিদ-দেহ থেকেই জন্তু-দেহের পুষ্টি। যে-সব প্রধান মাল-মসলায় জীব-দেহ তৈরি তা সবই ছড়িয়ে আছে মাটিতে, হাওয়ায়। তাদের খাদ্যে পরিণত করবার শক্তি কোনো জীবেরই নেই। সে শক্তি একমাত্র আছে উদ্ভিদের। উদ্ভিদ হাওয়া হতে, মাটি হতে মাল-মসলা নিয়ে যে খাদ্য তৈরি করে তাই গ্রহণ ক'রে জন্তু-দেহ পুষ্টিলাভ করে, জন্তু বেঁচে থাকে।

বাণী-বিনিময়

মা, যদি তুই আকাশ হতিস ; আমি চাঁপার গাছ,
তোর সাথে মোর বিনি-কথায় হত কথার নাচ।
তোর হাওয়া মোর ডালে ডালে কেবল থেকে থেকে
কতরকম নাচন দিয়ে আমায় যেত ডেকে।
'মা' ব'লে তার সাড়া দেব, কথা কোথায় পাই—
পাতায় পাতায় সাড়া আমার, নেচে উঠত তাই—
তোর আলো মোর শিশির-ফোঁটায় আমার কানে কানে
টল্‌মলিয়ে কী বলত যে ঝল্‌মলানির গানে।
আমি তখন ফুটিয়ে দিতেম আমার যত কুঁড়ি,
কথা কইতে গিয়ে তারা নাচন দিত জুড়ি।

উড়ো মেঘের ছায়াটি তোর কোথায় থেকে এসে
আমার ছায়ায় ঘনিয়ে উঠে কোথায় যেত ভেসে।
সেই হত তোর বাদল-বেলার রূপকথাটির মতো—
রাজপুত্তুর ঘর ছেড়ে যায় পেরিয়ে রাজ্য কত।
সেই আমারে ব'লে যেত কোথায় আলেখ-লতা—
সাগর-পারের দৈত্যপুরের রাজকন্যার কথা।
দেখতে পেতেম, দুয়োরানীর চক্ষু ভরো-ভরো—
শিউরে উঠে পাতা আমার কাঁপত থরোথরো।
হঠাৎ কখন বৃষ্টি তোমার হাওয়ার পাছে পাছে
নামত আমার পাতায় পাতায় টাপুর-টুপুর নাচে ;
সেই হত তোর কাঁদন সুরে রামায়ণের পড়া,
সেই হত তোর গুন্‌গুনিয়ে শ্রাবণ-দিনের ছড়া।

মা, তুই হতিস নীলবরনী, আমি সবুজ কাঁচা ;
তোর হত মা, আলোর হাসি আমার পাতার নাচা।
তোর হত মা, উপর থেকে নয়ন মেলে চাওয়া ;
আমার হত আঁকুবাঁকু হাত তুলে গান গাওয়া।
তোর হত মা, চিরকালের তারার মণিমালা ;
আমার হত দিনে দিনে ফুল-ফোটাবার পালা।

দীনবন্ধু

সে আজ প্রায় ত্রিশ বছর আগেকার কথা। লণ্ডনের বিখ্যাত চিত্রকর রোটেন্‌স্টাইনের বাড়িতে সাহিত্যিক আসর বসেছে। ইংরেজি গীতাঞ্জলির খসড়া পড়া হচ্ছে। ইয়েট্‌স্ নামে একজন নামজাদা কবি অনুবাদগুলি পড়ে শোনাচ্ছেন। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং উপস্থিত আছেন। পাঠ শেষ হল। সকলে চ'লে গেলে পর একজন ইংরেজ যুবক কাছে এসে কোনো কথা না ব'লে রবীন্দ্রনাথের হাত নিজের হাতে নিলেন। তাঁর মুখে আনন্দের আভা, চোখে যেন পূজার প্রদীপ জ্বলছে। এই ইংরেজ যুবকই চার্‌ল্‌স্ ফ্রিয়র এণ্ড্রূজ। এই ভাবেই তিনি প্রথম রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ পান। সেই পরিচয়ের সম্বন্ধে এণ্ড্রূজ বলেছেন, "সেদিন আমার জীবনের একটি স্মরণীয় দিন। সে-রাতে আমার আর ঘুম হল না। রবীন্দ্রনাথের বাড়ির সামনেই একটা মাঠে একা পায়চারি করতে লাগলাম। ওঁর কবিতার চরণগুলি আমার মনে যেন বাজতে লাগল।"

আর দেরি সইল না, তার পরদিনই তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করলেন ও শান্তিনিকেতনের কাজে যোগ দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। সেই দিন থেকে তাঁদের যে বন্ধুত্বের শুরু তার কথা পরে হবে। এখন একটু পিছন ফেরা যাক।

১৮৭১ খৃস্টাব্দে কার্লাইল শহরে এক ধর্মনিষ্ঠ পাদ্রির পরিবারে এণ্ড্রূজের জন্ম। সংগতি কম অথচ বৃহৎ সংসার ব'লে তাঁর মাকে অনেক দুঃখে খরচ চালাতে হত। বালক চার্লি মা'র এই দুঃখ বুঝতেন। ছেলেবেলা থেকেই পড়াশুনায় তাঁর এত মন ছিল যে, তাঁর স্কুল-কলেজের খরচের কথা বাড়ির লোকদের ভাবতে হত না। ভালো ছাত্র হিসাবে তিনি যে বৃত্তির টাকা পেতেন তা থেকে তাঁর নিজের শিক্ষার ব্যয় তো মিটতই, এমন-কি, তিনি তাঁর ছোটো ছোটো ভাইবোনদের পড়াশুনার আংশিক ব্যবস্থা সেই টাকা থেকেই করতেন।

জলপানি-পাওয়া ছাত্র ছিলেন বটে, কিন্তু বইয়ের পোকা বলতে যা বোঝায় তিনি সেরকমটি কখনো ছিলেন না। অমন সুস্থ সবল শরীর, অমন নৌকা-বাইচ ক্রিকেট ইত্যাদি খেলাধুলায় পটু ছেলে তাঁর সমান-বয়সীদের মধ্যে খুব কমই ছিল। তিনি যখন

কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তখন তাঁর বন্ধুদের বলতেন যে, তাঁর জীবনের লক্ষ্য হল দুটি— ডেভিড লিভিংস্টোনের মতো বন-জঙ্গল পেরিয়ে বিপদ-আপদ তুচ্ছ ক'রে অচেনা অজানা জায়গায় ঘুরে বেড়ানো, আর যীশুখৃস্টের ধর্ম ও উপদেশ -প্রচার। তাঁর পরবর্তী জীবনের ঘটনাগুলি থেকে দেখা যায় যে তাদের মূলে এই দুটি সংকল্প চিরকাল কাজ ক'রে এসেছে। দূরকে নিকট ও পরকে ভাই ব'লে স্বীকার করার চেষ্টায় তিনি কখনো কোনোরকম বাধা-বিপদে ভয় পান নি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় সব চাইতে উঁচু জায়গা তিনি দখল করলেন। যে পেম্‌ব্রোক কলেজের তিনি ছাত্র সেইখানেই তাঁকে অধ্যাপনা করবার সম্মান দেওয়া হল। কিন্তু তাতে তাঁর মন ভরল না। ধর্মযাজকের দীক্ষা নিয়ে তিনি দিল্লির এক মিশনারি কলেজে চ'লে এলেন ইংরেজি সাহিত্য ও ইতিহাসের অধ্যাপক হয়ে। তখন তাঁর বয়স হবে ত্রিশ বছরের কিছু বেশি।

এ দেশে এসেই তাঁর চোখে পড়ল, মানুষে মানুষে কী ভীষণ ভেদ। একটু তলিয়ে দেখে এণ্ড্রূজ বুঝলেন, অনেক পাপ জ'মে গেছে। স্থির করলেন, তিনি সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবেন ভারতের গরিব-দুঃখীদের সেবা ক'রে। তখন এ দেশ থেকে দলে দলে কুলি চালান যেত দক্ষিণ-আফ্রিকায়। এ-সব দেশছাড়া লক্ষ্মীছাড়া কুলিদের সে দেশে দুর্দশার শেষ ছিল না। দিল্লির কাজে মন দেওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব হল, তিনি ছুটি নিয়ে এলেন লণ্ডনে। যখন তাঁর মনের এইরকম অবস্থা ঠিক সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হল রোটেন্‌স্টাইনের বাড়িতে। ভারতে ফিরে এসে ১৯১২ খৃস্টাব্দে দিল্লির সেণ্ট্‌ স্টিফেন্স্‌ কলেজের অধ্যাপকের পদ ত্যাগ করলেন ও শান্তিনিকেতনের কাজে যোগ দেবার আগে, রবীন্দ্রনাথের অনুমতি নিয়ে দক্ষিণ-আফ্রিকায় গেলেন। সে দেশে কী ভাবে তাঁর সঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর দেখা হল ও দুজনে মিলে কী উপায়ে প্রবাসী ভারতীয়দের কিছু কিছু সুখ-সুবিধার বন্দোবস্ত ক'রে এলেন সে গল্প এখন থাক্‌।

১৯১৪ খৃস্টাব্দে এণ্ড্রূজ শান্তিনিকেতনে এলেন স্থায়িভাবে এখানকার কাজে যোগ দিতে।

প্রায় পঁচিশ বছরেরও বেশি সময় এণ্ড্রুজ শান্তিনিকেতনের আশ্রমের নানা কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। যেখানে দুঃখ বন্যা দুর্ভিক্ষ মহামারী, সেখানেই তাঁর ডাক পড়ত ব'লে তিনি কোথাও ঘর বাঁধতে পারেন নি। তবু যদি তাঁর সত্যিকার বাসা কোথাও থাকে তো সে এই শান্তিনিকেতন। খালি পা, পরনে খাটো খদ্দরের ধুতি, গায়ে হাতকাটা পাঞ্জাবি, সাদা দাড়িগোঁফ, মুখে সরল হাসি— তিনি হন্ হন্ করে চলেছেন কাঁকর-ঢালা রাঙা রাস্তায়— এ ছবি যেন এখনো চোখের সামনে ভেসে ওঠে। আর-একটি ছবি মনে না প'ড়ে পারে না— খৃস্ট-উৎসবের দিন শান্তিনিকেতনে মন্দিরের বেদীতে ব'সে তিনি যীশুর জন্মকথা বলছেন— অনেক দিন আগের ছেলেবেলায় তাঁর নিজের মা'র মুখে শোনা। সেই সহজ সুন্দর গল্পটি এখনো যেন কানে বেজে ওঠে।

এণ্ড্রুজ একজন সত্যিকার খৃস্টান ছিলেন। খৃস্ট বলেছেন, পরম পিতার কাছে তাঁর সকল সন্তানই সমান। এণ্ড্রুজের চোখেও মানুষে মানুষে ভেদাভেদ ছিল না। রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজির মতো তিনিও তাঁর সমস্ত জীবন ধ'রে এই চেষ্টা ক'রে গেছেন যাতে সকল মানুষ এক মনে ও এক প্রাণে মিলতে পারে। যাঁরা ভাবেন, তিনি কেবল ভারতের বন্ধু ছিলেন, তাঁরা ভুল করেন। আশ্রমের কাজে তিনি যে তাঁর শেষ ক'বৎসর দিয়েছিলেন তার কারণ এই যে, রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে সকল দেশের সকল মানুষের একটি মিলনের ঠাঁই তৈরি করেছেন। ছেলেবুড়ো সকলের সঙ্গে তাঁর সমান ভাব ছিল। গরিব-দুঃখীদের তিনি ছিলেন সেবক, তাই আমাদের দেশের লোকেরা এণ্ড্রুজের নাম দিয়েছিল 'দীনবন্ধু'।

১৯৪০ খৃস্টাব্দের ৫ই এপ্রেল কলকাতায় দীর্ঘ রোগভোগের পর প্রায় সত্তর বছর বয়সে দীনবন্ধুর মৃত্যু হয়। মৃত্যুশয্যায় তিনি ব'লে গেছেন, "আমি নিয়ত প্রার্থনা করি, যেন এই দুঃখের পৃথিবীতে ভগবানের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়, যেন আমরা সকলে তাঁরই ইচ্ছা পূর্ণ করি।"

অনুকূলবাবু

ঘাসে আছে ভিটামিন,
গোরু ভেড়া অশ্ব
ঘাস খেয়ে বেঁচে আছে—
আঁখি মেলে পশ্য।
অনুকূলবাবু বলে—
ঘাস খাওয়া ধরা চাই,
কিছুদিন জঠরেতে
অভ্যেস করা চাই;
বৃথাই খরচ ক'রে চাষ করা শস্য।

গৃহিণী দোহাই পাড়ে
মাঠে যবে চরে সে;
ঠেলা মেরে চ'লে যায়
পায়ে যবে ধরে সে—
মানবহিতের ঝোঁকে কথা শোনে কস্য।

দুদিন না যেতে যেতে
মারা গেল লোকটা,
বিজ্ঞানে বিঁধে আছে
এই মহা শোকটা—
বাঁচলে প্রমাণ শেষ হত্ত যে অবশ্য।
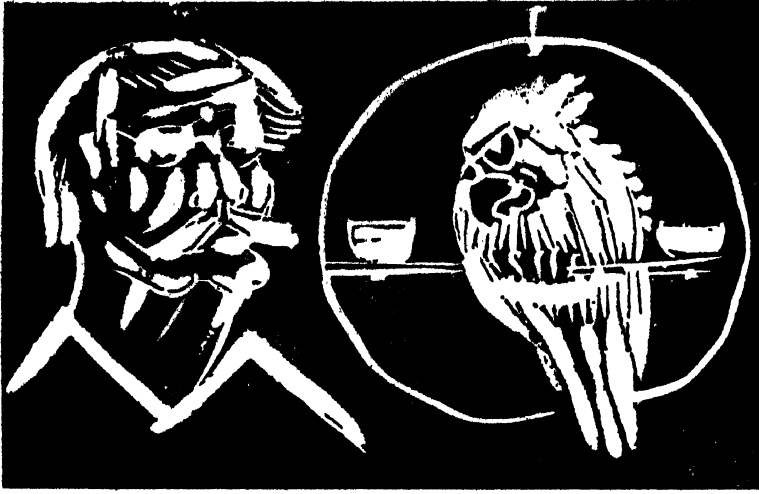
হুমুর্খ

টেরিটিবাজারে এক পাখির দোকান। দরজার উপর মস্ত সাইনবোর্ড, তাতে লেখা— 'গোপেশ্বর অ্যাণ্ড কোং'। ঢুকলেই চোখে পড়ে সারি সারি পিঁজরে, কোনোটা ঝুলছে, কোনোটা বা মেজের উপর। দোকানে আছে নানারকম পাখি, তাদের হরেকরকম আওয়াজে কান ঝালাপালা হয়ে ওঠে, রঙিন পাখার বাহারে চোখ যায় ঝল্‌সে।

এই দোকানের এক কোণে হুমুর্খের খাঁচা ঝুলছে— ধব্‌ধবে কাকাতুয়াটি। সকালবেলা ছাতু খাওয়া সেরে সে যখন দাঁড়ের এক কোনায় গম্ভীরমুখে চোখ বুজে ব'সে থাকে, তখন তাকে দেখায় চাদর-গায়ে-দেওয়া পরম পণ্ডিতের মতো। হুমুর্খ কিন্তু বেজায় সেয়ানা।

এক ছাতুওয়ালা কাকাতুয়ার খাবার জোগায়। পাওনা নিয়ে দোকানের মালিকের সঙ্গে লোকটার বনিবনা হত না, তাই বোধ হয় ও লুকিয়ে লুকিয়ে রোজ হুমুর্খকে পড়িয়ে যেত—

গোঁপের রাজা গোঁপেশ্বর
সদাই গোঁপে তা,
ওর দোকানে কোকিলগুলোর
কাকের মতো রা।

একদিন দোকান বন্ধ করার আগে গোপেশ্বর হিসাব করছে এমন সময় দুর্মুখ হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল— গোঁপের রাজা গোঁপেশ্বর। গোপেশ্বর তো রেগে আগুন। চেহারায় ওর সব চাইতে দেমাকের জিনিস ছিল জমকালো গোঁপজোড়া— তাকে নিয়েই কিনা ঠাট্টা। পাখিটার আস্পর্ধা তো কম নয়। সে ধমক দিয়ে বললে, "চুপ কর্, চেঁচাস্ নে।" দুর্মুখ কি আর চুপ করে। রোজ সে ঐ একই ছড়া কাটে, তালে তালে ঘাড় দুলিয়ে। গোপেশ্বর যত চটে তত যেন ওর জেদ চ'ড়ে যায়, ততই গলা ছেড়ে দুর্মুখ চেঁচাতে থাকে—

ওর দোকানে কোকিলগুলোর
কাকের মতো রা,
গোঁপের রাজা গোঁপেশ্বর
সদাই গোঁপে তা।

খদ্দেরের দল দুর্মুখের কথা শুনে মুখ টিপে হেসে অন্য দোকানে চলে যায়; লজ্জায় গোপেশ্বরের জাঁকালো গোঁপজোড়া যেন নুয়ে পড়ে। বেচারি কেবল হাঁকে, "চুপ কর্, চেঁচাস্ নে।"

সেদিন বেশি ছাতু খেয়ে কাকাতুয়ার হ'ল অসুখ, খাঁচার এক কোনায় সে নিঝুম হয়ে ব'সে আছে। এমন সময় খদ্দের এল এক গাইয়ে ওস্তাদ। তার কাকাতুয়া পোষার ভারি শখ। সে বলত— যে কাকাতুয়া পড়ে না, শিখিয়ে পড়িয়ে নিলে সে ওস্তাদ গাইয়ে হতে পারে। সুবিধে বুঝে গোপেশ্বর দিলে দুর্মুখকে বেচে ডবল দামে— পাপ বিদায় হল, টাকাও এল ট্যাঁকে।

গাইয়ে সকাল-সন্ধে বিকট গলায় চেঁচিয়ে সুর সাধে। ডান হাতে তানপুরা নিয়ে বাঁ হাতটা কানে চেপে সে যখন গিট্‌কিরি দিত তখন আসরের এক কোনায় ব'সে দুর্মুখ

তার ঘাড় ফিরিয়ে কী ভাবত কে জানে। একদিন গান জমে উঠেছে, শাগরেদের দল বলছে— "বহুৎ আচ্ছা! কেয়াবাৎ! কামাল কিয়া!" এমন সময় ঝাঁজালো গলায় হঠাৎ কে যেন চেঁচিয়ে উঠল— "চুপ কর্, চেঁচাস্ নে।" সবাই হতভম্ব। ওস্তাদ ভাবছে, বুঝি কোনো শাগরেদের কারসাজি। এমন সময় হুবহু গোপেশ্বরের গলায় দুর্মুখ আবার হেঁকে উঠল, "চেঁচাস্ নে বলছি।" আসর গেল ভেঙে, ওস্তাদ গোসা ক'রে উঠে গেলেন। সব নষ্টামির মূল ঐ পাখিটাকে তাঁর একজন ভক্ত সরিয়ে নিয়ে এল নিজের বাড়িতে।

ছেলেপুলের বাড়ি, সবাই খাঁচার চার দিকে ভেঙে পড়ে। পাছে দুর্মুখ আবার বিরক্ত হয়ে বাঁকা ঠোঁটের ঠোকর মারে এই ভয়ে বাড়ির গিন্নি সারাক্ষণ ছোটোদের সাবধান ক'রে দেন, "খবর্দার, ছুঁস্ নে কিন্তু, ছুঁবি কি মরবি।"

ঐ পাড়াতেই এক ফিরিওয়ালা রোজ সন্ধেবেলা সাদা একটা ঠেলাগাড়ি ঠেলতে ঠেলতে হেঁকে যায় "আ-ই-স্-ক্রীম্"! বড়ো রাস্তার ধুলোয় চেঁচিয়ে তার গলা গিয়েছিল ভেঙে। ক'দিন ধ'রেই সে মতলব আঁটছে— কী উপায় করা যেতে পারে। দুর্মুখকে সেদিন দেখে তার একটা খাসা বুদ্ধি মাথায় এল; ভাবল, "সাদা গাড়িতে জুড়ব একটা সাদা খাঁচা আর সেই খাঁচায় থাকবে এই কাকাতুয়া। শিখিয়ে পড়িয়ে নিলে পাখিটাই আমার হয়ে হাঁকবে— 'আ-ই-স্-ক্রীম্'।" যথা ভাবা তথা কাজ। গিন্নিমাও দুর্মুখকে বিদায় ক'রে নিশ্চিন্ত হলেন।

দুদিনে ফিরিওয়ালার ব্যাবসা উঠল ফেঁপে। দুর্মুখ হাঁকে "আ-ই-স্ ক্রী-ম্"— আর টিফিনের সময় ছাড়া-পাওয়া ছেলের দল হুড়মুড় ক'রে এসে হাজির হয়। এক-আনা দু-আনায় ঠোঙা বিক্রি ক'রে ফিরিওয়ালার বেশ কিছু লাভ হয়।

সেদিন দুপুরের গরমে দুর্মুখের ভারি ঘুম পেয়েছে, গলা দিয়েও ডাক যেন আর বেরুতে চায় না। কিন্তু, ছেলে-ছোকরার দল মানবে কেন? তারা জেদ ধ'রে বসল— কাকাতুয়ার হাঁক শুনবেই। খদ্দেরের কথা তো ফেলবার নয়, তাই ফিরিওয়ালা একটা কাঠি দিয়ে দুর্মুখকে খোঁচা দিতে লাগল। পাখার ঝাপটা দিয়ে নারাজ পাখি খাঁচার এক কোনায় সরে গিয়ে ঘাড় গুঁজে বসে রইল। এ দিকে ক্লাসের সময় হয়ে এল, ছেলের দল অগত্যা যে যার আইস্ক্রীম নিয়ে চলে যাবে— এমন

সময় মেয়েলি গলায় কে যেন চেঁচিয়ে উঠল, "খবর্দার, ছুঁস্ নে কিন্তু, ছুঁবি কি মরবি।" কোত্থেকে আওয়াজ এল, কেউ ঠাহর করতে পারে না। ফিরিওয়ালা এ দিকে ব্যাপারটা বুঝে নিয়েছে। ছেলের দল যতক্ষণে এ ওর মুখ-চাওয়াচাওয়ি করছে ততক্ষণে সে গাড়ি ঠেলে একেবারে সদর রাস্তায় এসে হাজির। আর কি সে সেখানে থাকে।

সন্ধেবেলা সে ফিরছে বাড়িতে—টেরিটিবাজারের রাস্তা দিয়ে। হঠাৎ তার খেয়াল হল পাখিটাকে বেচে দিলে তো ল্যাঠা চুকে যায়। রাস্তার আলোয় দেখলে পাশেই একটা দোকান, মস্ত সাইন্‌বোর্ড ঝুলছে—'গোপেশ্বর অ্যাণ্ড কোং—এই দোকানে সকলরকম পাখি ক্রয়বিক্রয় করা হয়।' খাঁচা হাতে সে দরজার কাছে দাঁড়ালো।

এ দিকে হিসাবপত্তর সেরে গোপেশ্বর দরজা খুলে বেরবে এমন সময় দেখে—ফিরিওয়ালার হাতে সুন্দর একটা সাদা খাঁচা, ভিতরে ধব্‌ধবে এক কাকাতুয়া। তার আর খুশি ধরে না। পাখিটি তার ভারি পছন্দ, ডবল দামে কিনে যত্ন ক'রে খাঁচা ঝুলিয়ে দিল সেই আগের কোনাটিতে। গোঁপ চুমরিয়ে চুমকুড়ি দিয়ে বলল, "বলো, রাধে কৃষ্ট বলো।" হুর্মুখ চোখ পাকিয়ে কেবল চেয়ে রইল। যেই গোপেশ্বর খাঁচাটা একটু নেড়েছে অমনি সে চেঁচিয়ে উঠল, "খবর্দার, ছুঁস্ নে কিন্তু, ছুঁবি কি মরবি।" গোপেশ্বর তো অবাক—আপন মনেই বিড়্‌বিড়্ করছে, 'এমন বদরাগী পাখি জন্মে দেখি নি বাপু।' হুর্মুখ হেঁকে উঠল, "চুপ কর্, চেঁচাস্ নে।" এবার আর গোপেশ্বরের বুঝতে দেরি হল না; এ গলা যে হুবহু ওর নিজের গলার মতো শোনাচ্ছে। গোঁপে তা দেওয়া গেল থেমে, মাথায় হাত দিয়ে বেচারি ধপ ক'রে মেঝেতে ব'সে পড়ল। ততক্ষণে তালে তালে ঘাড় দুলিয়ে হুর্মুখ চেঁচাতে লেগেছে—

"গোঁপের রাজা গোঁপেশ্বর
সদাই গোঁপে তা,
ওর দোকানে কোকিলগুলোর
কাকের মতো রা।"

ভজহরি

হংকঙেতে সারা বছর আফিস করেন মামা,
সেখান থেকে এনেছিলেন চীনের দেশের শ্যামা,
দিয়েছিলেন মাকে—
ঢাকার নীচে যখন-তখন শিস দিয়ে সে ডাকে।

নিচিনপুরের বনের থেকে ঝুলির মধ্যে ক'রে
ভজহরি আনত ফড়িঙ ধ'রে।
পাড়ায় পাড়ায় যত পাখি খাঁচায় খাঁচায় ঢাকা,
আওয়াজ শুনেই উঠত নেচে ঝাপট দিয়ে পাখা।
কাউকে ছাতু, কাউকে পোকা, কাউকে দিত ধান,
অসুখ করলে হলুদ-জলে করিয়ে দিত স্নান।
ভজু বলত, "পোকার দেশে আমিই হচ্ছি দত্যি,
আমার ভয়ে গঙ্গাফড়িঙ ঘুমোয় না এক-রত্তি।
ঝোপে ঝোপে শাসন আমার, কেবলই ধর-পাকড়,
পাতায় পাতায় লুকিয়ে বেড়ায় যত পোকামাকড়।"

একদিন সে ফাগুন মাসে মাকে এসে বলল,
"গোধূলিতে মেয়ের আমার বিয়ে হবে কল্য।"
শুনে আমার লাগল ভারি মজা—
এই আমাদের ভজা,
এরও আবার মেয়ে আছে, তারও হবে বিয়ে,
রঙিন চেলির ঘোমটা মাথায় দিয়ে!

শুধাই তাকে, "বিয়ের দিনে খুব বুঝি ধুম হবে।"
ভজু বললে, "খাঁচার রাজ্যে নইলে কি মান রবে?
কেউ-বা ওরা দাঁড়ের পাখি, পিঁজরেতে কেউ থাকে,
নেমন্তন্ন চিঠিগুলো পাঠিয়ে দেব ডাকে।
মোটা মোটা ফড়িঙ দেব, ছাতুর সঙ্গে দই,
ছোলা আনব ভিজিয়ে জলে, ছড়িয়ে দেব খই।
এমনি হবে ধুম,
সাত পাড়াতে চক্ষে কারও রইবে না আর ঘুম।
ময়নাগুলোর খুলবে গলা, খাইয়ে দেব লঙ্কা,
কাকাতুয়া চীৎকারে তার বাজিয়ে দেবে ডঙ্কা।
পায়রা যত ফুলিয়ে গলা লাগাবে বক্‌বকম্‌,
শালিকগুলোর চড়া মেজাজ, আওয়াজ নানারকম।
আসবে কোকিল, চন্দনাদের শুভাগমন হবে,
মন্ত্র শুনতে পাবে না কেউ পাখির কলরবে।
ডাকবে যখন টিয়ে
বরকর্তা রবেন ব'সে কানে আঙুল দিয়ে।"

গরম জলে ও গরম হাওয়ায় স্রোত

কেৎলিতে জল ভ'রে আগুনে বসালে তা আস্তে আস্তে গরম হতে থাকে। আগুনের তাপ লাগছে কেৎলির তলায়, সেই তাপটা সমস্ত জলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে কী ক'রে? আগুনে কেৎলির তলাটা তেতে ওঠে, তার গায়ে লেগে থাকায় তলার জল গরম হয়ে হালকা হয়। এই হালকা গরম জল তখন আর নীচে থাকতে পারে না, উপরে উঠে আসে, উপরের ঠাণ্ডা ভারী জল নীচে নেমে যায়। এই জল আবার গরম হয়ে উপরে উঠে যায়। অর্থাৎ, আগুনে বসালে জলের মধ্যে একটা স্রোত জন্মে, গরম হয়ে নীচে থেকে জল উপরে ওঠে, আর ঠাণ্ডা জল উপর থেকে নীচে নামে। এই-ভাবেই সমস্ত জল আস্তে আস্তে গরম হয়, সব জল একসঙ্গে একেবারে গরম হয়ে ওঠে না। কাঠের গুঁড়ো বা ছোটো ছোটো কাগজের টুকরো গরম জলের মধ্যে ফেলে দিলে সেগুলি ক্রমাগত উপরে-নীচে ওঠানামা করতে থাকে, জলের মধ্যে যে একটা স্রোত চলেছে তা তখন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যে জলের উপরে-নীচে কোনো ভেদই চোখে দেখি না তার মধ্যে যে একই কালে গরম ও ঠাণ্ডা জলের একটা স্রোত চলতে পারে তার প্রমাণ পাওয়া গেল এই স্রোতটা কাঠের গুঁড়ো বা কাগজের টুকরোর যোগে স্পষ্ট ক'রে দিয়ে। আগুনে জল গরম হওয়ার ব্যাপারটাকে আমরা সহজ বলেই ধরে নিই। কিন্তু এখন জানা গেল, এটা মোটেই সহজ নয়, জলের মধ্যে অনেকগুলি কাণ্ড ঘটলে তবে জল গরম হয়।

গরম হাওয়ায় কী করে একটা স্রোত জন্মায় তার কথা এখন বলা যাক। আলো জ্বেলে তার কাছাকাছি উপরের দিকে হাত রাখলে যতটা গরম লাগে আশেপাশে আর কোথাও ততটা লাগে না। শীতকালে আগুন জ্বেলে তার চার দিকে ব'সে আমরা আগুন পোহাই। পাশে ব'সে আগুনের যতটা কাছে হাত নিতে পারি, উপর থেকে ততটা কাছে নিতে গেলে হাত যাবে পুড়ে। আগুন জ্বাললে তার উপরের দিকটা বেশি গরম হয়ে ওঠে কেন? আগুনে হাওয়া গরম হয়ে হালকা হয়, তাই উপর দিকে উঠে যায়। আশেপাশের অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা হাওয়া ঐ খালি জায়গা দখল করতে

ছুটে আসে, অর্থাৎ উত্তাপে হাওয়ার ভিতরে একটা স্রোত চলতে থাকে। আগুনের উপরে হাত রাখলে এই গরম হাওয়ার স্রোত এসে হাতে লাগে, তাই এতটা গরম বোধ করি। সূর্যের তাপে মাটি গরম হয়, তার সংস্পর্শে এসে হাওয়া গরম হয়ে উপরে উঠে যায়, ঠাণ্ডা হাওয়া চার দিক থেকে ছুটে আসে ঐ খালি জায়গা দখল করতে। কখনো কখনো হাওয়ার এই চলাফেরার বেগ এতটা বেড়ে ওঠে যে তার প্রবল আঘাতে বাড়িঘর গাছপালা ভেঙে পড়ে। ঝড়, তুফান, সাইক্লোন, টাইফুন, টর্‌নেডো, আসলে এরা কিন্তু হাওয়ারই স্রোত; বেগের কম-বেশি অনুসারে এদের আমরা বিভিন্ন নাম দিয়ে থাকি।

সম্রাট অশোক

এখনকার পাটনাকে আগে পাটলিপুত্র বলা হত। দুহাজার বছরেরও আগে এই পাটলিপুত্র ছিল খুব জমকালো নগর। মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত ছিলেন সেখানকার রাজা। মায়ের নাম মুরা ছিল ব'লে চন্দ্রগুপ্তকে মৌর্য বলা হয়। তিনি খুব বিখ্যাত আর শক্তিশালী রাজা ছিলেন। চন্দ্রগুপ্তের ছেলে বিন্দুসার। বিন্দুসারের অনেক ছেলে। তার মধ্যে একজনের নাম অশোক। বিন্দুসার মারা গেলে অশোক গায়ের জোরে আর বুদ্ধির জোরে রাজসিংহাসন দখল ক'রে রাজা হন।

অশোক প্রথমে নিষ্ঠুর আর খামখেয়ালী ছিলেন। তাঁর চেহারা সুশ্রী ছিল না। একদিন তাই নিয়ে তাঁর এক রানী একটু হাসি-তামাশা করেন, তাতে রাজা রেগে গিয়ে রানীকে পুড়িয়ে মারেন। অশোক আপনাকে ইন্দ্রের সমান মনে করতেন। তবে ইন্দ্রের দখলে শুধু স্বর্গ নয় নরকও আছে, তাঁরই বা তা থাকবে না কেন? কাজেই রাজধানী পাটলিপুত্রে একটি চমৎকার বাড়ি তৈরি করলেন, তার নাম দিলেন নরক। সেখানে যমদূতের মতো ভয়ংকর সব প্রহরী ব'সে গেল। অশোক তাদের ব'লে দিলেন, "যে-কেউ এই বাড়িতে ঢুকবে অমনি তাকে দেবে সাবাড় ক'রে।" এই নরকে কত লোক যে শুধু শুধু গেল মারা তার হিসেব নেই। একদিন এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী সেই বাড়িতে এসে যেমন ঢুকলেন অমনি প্রহরীগুলো ধরল চেপে, কিন্তু সন্ন্যাসীর প্রশান্ত চেহারা দেখে তারা তাঁকে না মেরে ফেলে রাজার কাছে খবর দিল। রাজা এলেন। সন্ন্যাসী তাঁকে নানারকম ধর্ম-উপদেশ দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন, আমরা যখন কাউকে প্রাণ দিতে পারি নে তখন শুধু শুধু কারও প্রাণ নেওয়াও আমাদের অন্যায়, প্রাণীহত্যা মহাপাপ। রাজার মন নরম হল, সন্ন্যাসীর উপদেশে বৌদ্ধধর্মের দিকে তাঁর মন টানল, তিনি তাঁর নরক ধ্বংস ক'রে ফেললেন।

কিন্তু, রাজ্য বাড়াবার দিকে অশোকের ঝোঁক চেপে গেল। এক-এক ক'রে ভারতবর্ষের প্রায় সব দেশই তিনি জয় করলেন। এখন তিনি হলেন সম্রাট অর্থাৎ রাজাদের রাজা। অশোক তাঁর ছোটো ভাই বীতশোককে প্রাণের চেয়ে ভালোবাসতেন।

বীতশোক রাজার ছেলে হয়েও সংসারধর্ম না ক'রে জৈন সন্ন্যাসী হয়ে গেলেন; প্রাসাদ ছেড়ে চলে এলেন জৈন সন্ন্যাসীদের আশ্রমে। একদিন অশোক কোনো কারণে চ'টে গিয়ে হুকুম দিলেন, "কাটো জৈনদের মাথা।" বীতশোক তা শুনতে পেয়ে আগেই নিজের মাথা কাটিয়ে সম্রাটের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। সম্রাট তাঁর প্রিয় ভাইয়ের মুণ্ড দেখে শোকে অভিভূত হয়ে আদেশ ফিরিয়ে নিলেন। জৈনের দল গেল বেঁচে।

আজকালকার উড়িষ্যাকে আগে বলত কলিঙ্গ। অশোক গেলেন কলিঙ্গ জয় করতে। ভীষণ যুদ্ধ হল। সে দেশের রাজা গেল হেরে। এই যুদ্ধে অশোকের চোখের সামনেই হাজার হাজার লোক মরল। অস্ত্রের আঘাতে জলজ্যান্ত মানুষগুলো গেল ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে। ঘরে ঘরে বাপ ভাই স্বামী পুত্রের জন্যে হাহাকার উঠল। অশোকের মন গেল একেবারে বদলে। তিনি ফিরে এসে ধর্মের দিকে মন দিলেন।

এর পর বৌদ্ধধর্মের যাতে সবরকমে প্রসার হয় সেই চেষ্টায় লাগলেন। শুধু মানুষ নয়, পশুপাখিরাও যাতে তাঁর রাজত্বে নির্ভয়ে সুখে থাকতে পারে তারও ব্যবস্থা করলেন। দেশে দেশে ধর্মপ্রচার করতে লোক পাঠালেন, এমন-কি, নিজের ছেলে মহেন্দ্র ও মেয়ে সংঘমিত্রাকে সন্ন্যাসী ক'রে সিংহলে পাঠালেন বৌদ্ধধর্ম শেখাতে। সেই থেকে সিংহলীরা আজ পর্যন্ত বৌদ্ধ। পাহাড়ের গায়ে ও থামের উপরে তিনি উপদেশ আর আদেশ খোদাই করালেন। সারা ভারতবর্ষে এ-সব শিলালিপি ও স্তম্ভলিপি আজও ছড়িয়ে রয়েছে। এ-সব থেকে অশোকের সম্বন্ধে আমরা অনেক খবর জানতে পাই।

অশোকের প্রধান লক্ষ্য ছিল অহিংসা। মানুষ যে শুধু মানুষকেই ভালোবাসবে তা নয়, চারি পাশে যত পশুপাখি রয়েছে তাদেরও ভালোবাসবে। তিনি দানও করতেন কম নয়। রাজকোষে সোনা রুপো যা ছিল সবই তিনি দিয়ে দিলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁকে মাটির বাসন ব্যবহার করতে হয়েছিল। তাঁর দেশের লোকে তাঁকে বলত— দেবানাং প্রিয়ঃ প্রিয়দর্শী। জগতে এরকম সম্রাট আর হয় নি।

গান

ফিরে চল্ মাটির টানে,
যে মাটি আঁচল পেতে চেয়ে আছে
মুখের পানে।
যার বুক ফেটে এই প্রাণ উঠেছে,
হাসিতে যার ফুল ফুটেছে রে,
ডাক দিল যে গানে গানে॥

দিক্ হতে ঐ দিগন্তরে
কোল রয়েছে পাতা,
জন্মমরণ ওরই হাতের
অলখ সুতোয় গাঁথা।
ওর হৃদয়-গলা জলের ধারা
সাগর-পানে আত্মহারা রে,
প্রাণের বাণী বয়ে আনে॥
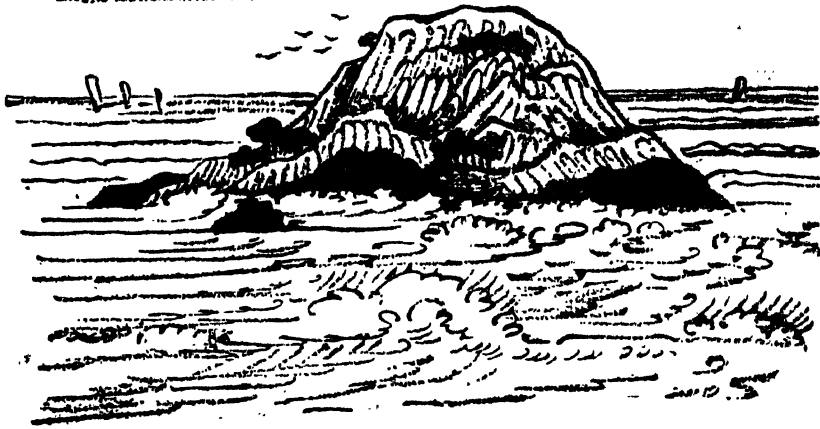
ট্রিস্ট্যান ডা কুন্হা ॥ ১ ॥

মস্ত বড়ো সমুদ্র, মহাসমুদ্র। এ সমুদ্র লম্বায় নহাজার মাইল, চওড়ায় পাঁচ-হাজার মাইল। যেখানে খুব সরু সেখানেও চওড়া ষোলোশো মাইল। এই বিরাট জলাশয়, এতে থৈ থৈ করছে জল, কেবল জল। এ জলের কুল-কিনারা নেই। যে জল থাকে অল্প জায়গায় বদ্ধ তারই আমরা সীমা নির্দেশ করি কুল দিয়ে, তীর দিয়ে। যে জল পৃথিবীর সমস্ত স্থলকে জন্ম দিয়েছে, রূপ দিয়েছে, বাহুর নানা ভঙ্গির বাঁধনে জড়িয়ে আছে, তার কুলই বা কী, কিনারাই বা কী। সকল দেশের সকল মহাদেশের কিনারা বেঁধে দেয় মহাসমুদ্রের জল।

এমনি সমুদ্র-ঘেরা এক দেশ আছে পৃথিবীর দক্ষিণ দিকে, আটলান্টিক মহাসমুদ্রের বুকে। দেশটার নাম ট্রিস্ট্যান। দেখলে মনে হয়, যেন একটা বিপুল তরঙ্গ কারও জাদুমন্ত্রে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। ঢেউ জমে গেছে, তার আর ভেঙে-পড়া হয় নি। দেশটা তৈরি আপাদমস্তক পাথর দিয়ে। ভিত তার মহাসমুদ্রের অতল জলে। বাতাস সেখানে অবিরাম চলেছে অবাধ গতিতে। তার পাথরের গায়ে আছড়ে পড়ছে সমুদ্রের ঢেউ, যেন লক্ষ লক্ষ অজগর সাপ ফণা তুলে কিল্‌বিল্ করছে তার চার ধারে।

ছোট্ট দেশ, তার চতুঃসীমা একবার ঘুরে আসতে হাঁটতে হয় মাত্র সাতাশ মাইল। বাতাসের প্রতাপে আর সমুদ্রের গর্জনে দেশটার এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত আলোড়িত ও মুখরিত।

শোনা যায়, একজন পর্তুগীজ নৌ-সেনাপতি ১৫০৬ খৃস্টাব্দে এই দ্বীপ আবিষ্কার করেন। তাঁর নাম ছিল ট্রিস্ট্যাও ডা কুন্‌হা, দ্বীপের নাম হয়েছে তাঁরই নাম থেকে। জানা গেছে, আবিষ্কারের পর থেকে ১৮১১ খৃস্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত দ্বীপটিতে কোনো জন-মানুষ বাস করে নি। এই তিনশো বৎসরেরও বেশি কাল ধ'রে সমুদ্র তার বাতাস আর ঢেউ, এবং আকাশ তার আলো মেঘ ও বৃষ্টি দিয়ে দেশটিকে লালন-পালন করেছে। কিন্তু মানুষ কোনোদিন সেখানে গিয়ে বাস করেছে এমন কথা জানা যায় নি। দক্ষিণ-আফ্রিকা থেকে দক্ষিণ-আমেরিকার ব্রেজিল যাবার পথে পড়ে এই দেশ। কত তো বিচিত্র সাধের মানুষ আছে, দেশ-বিদেশ তারা ঘুরে দেখে। এখানে যাবার সাধ তাদেরও হয় নি।

১৮১১ খৃস্টাব্দে এল এ দেশে আমেরিকার একজন লোক, ল্যাম্বর্ট তার নাম। বিচারালয়ে দণ্ড এড়াবার জন্য জলদস্যু হয়ে সমুদ্রে সমুদ্রে সে ঘুরে বেড়াত। ছয়জন সঙ্গী নিয়ে সে এসে হাজির হয়েছিল এই দ্বীপে। শোনা যায়, তাদের সঙ্গে ছিল অনেক সোনারুপো। তাই নিয়ে শুরু ক'রে দিল এই দ্বীপে বাস করতে। কিন্তু সোনারুপো খাওয়াও যায় না, পরাও যায় না। তবে তারা থাকত কেমন ক'রে।

কোথাও বাস করতে হলে চাই ঘরবাড়ি, চাই খাবার সামগ্রী, আর চাই পরবার কাপড়। যে দেশে মানুষ থাকে নি কোনো কালে, যে দেশে মাটি বলতে শুধুই পাথর, সে দেশে ঘরবাড়িও থাকে না, অন্নবস্ত্রও মেলে না। ফল নেই, মূল নেই, ফসল নেই; বন-জঙ্গল নেই, জন্তু-জানোয়ার নেই, ছাল-বাকল নেই। মানুষ খায় কী, পরে কী, থাকে কোথায়? একটু ভেবে দেখা যাক্।

চার ধারে সমুদ্র, আফ্রিকা থেকে দক্ষিণ-আমেরিকায় জাহাজ-যাতায়াতের একটা পথ। কালেভদ্রে বছরে দু-চারবার ধার দিয়ে যেতে যেতে দু-চারখানা জাহাজ দ্বীপে লাগে, যেমন পথের ধারে একখানা ঘর থাকলে ক্লান্ত পথিক সেখানে একটু জিরিয়ে

নেয়। দস্যুর সোনা তখন কাজে লেগে যায়। জাহাজের বণিক টাকা পেয়ে দিয়ে যায় কিছু অন্ন, কিছু বস্ত্র। পাথুরে দ্বীপ, অনেক জাহাজ ঝড়ের তাড়ায় দ্বীপের গায়ে আছাড় খেয়ে ভেঙে যায় টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে। লোকজন যায় ম'রে। বড়ো বড়ো কাঠ আর নানারকম কাজের জিনিস ভেসে ভেসে তীরে ঠেকে। কতক কাঠ বাড়ি-তৈরির কাজে লেগে যায়, আর কতক হয় জ্বালানি কাঠ। এমনি ক'রে এ দ্বীপের প্রথম অধিবাসী সাতজন মানুষ ঘরকন্না করতে লাগল।

চার ধারে কেবল সমুদ্রের নোনা জল। পানীয় জল এক ভাবনার কথা। তাও অল্পতেই মিটে গেল। ছোট্ট দ্বীপ, একটু খুঁজেই ঝরনা পাওয়া গেল। সাড়ে সাত হাজার ফুট এক পর্বত ভেদ করে বেরিয়েছিল কোন্ কালে এক আগ্নেয়গিরির অগ্নি-উদ্গার। সে আগুন গেছে নিবে, কিন্তু পর্বতের চূড়ায় রয়ে গেছে এক মস্ত গহ্বর। বর্ষার নির্মল জলে পরিপূর্ণ থেকে সে গহ্বর হয়ে আছে এক মনোহর হ্রদ ; জল তার বরফের মতো ঠাণ্ডা।

পাঁচ-ছ বৎসর পরে ইংরেজরা গিয়ে দেশটা নিল দখল করে। দেশের নামটাও একটু বদলাল। ট্রিস্ট্যাও হয়ে গেল ট্রিস্ট্যান। প্রথম সাতজনার একজন মাত্র তখন বেঁচে। কিছু দিন পরে সেও গেল মারা। দেশে রইল তখন জনকতক ইংরেজ সৈন্য, সমস্ত দেশটাই যেন তাদের কেল্লা। এক বছর কেটে গেল, ও দেশে স্থায়ী হয়ে বাস করতে কেউ আসে না। কারও লোভ হয় না। আলো বাতাস আর জল ওর পাথরের গায়ে যে ছাপ দিয়ে আসছিল অনেক দিন ধরে, তার অবশ্য বিরাম হল না ; মানুষের শক্তিই কেবল পেরে উঠল না প্রকৃতির শক্তির সঙ্গে মানিয়ে চলতে।

মানুষের এই পরাজয়ের লজ্জা ঘোচালেন স্কট্ল্যাণ্ডের একজন বীরপুরুষ—উইলিয়ম গ্লাস। ১৮১৭ খৃস্টাব্দে তিনি তাঁর স্ত্রী ও দুটি শিশুসন্তান নিয়ে উপস্থিত হলেন ট্রিস্ট্যান দ্বীপে। দুজন যুবক সেইসঙ্গে এলেন। এঁরা এসে যে বাস শুরু করলেন সে হল স্থায়ী বাস। সুখে দুঃখে বহু পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে এঁরা দেশটাকে মানুষ থাকবার মতো ক'রে তোলবার চেষ্টায় লেগে থাকলেন। ক্রমে নানাদেশীয় অল্পকিছু লোক এখানে এসে থাকল। এদের কেউ-বা এল ইচ্ছায়, আবার কেউ-বা এসেছিল অনিচ্ছায়, কিন্তু থেকে গেল কোনো মায়ার টানে।

প্রজাপতি

ফুলের দেশের রাজকন্যা থাকে ফুলের বনে। পরনে তার বাসন্তী রঙের কচিপাতার শাড়ি। শিরীষ ফুলের ঝুমকো দোলানো কানে। মাথায় কৃষ্ণচূড়ার মুকুট, আর কপালে আলো ক'রে জ্বলে জোনাকিপোকার টিপ। পলাশ ফুলের পাপড়ি-ছড়ানো পথে তার টুকটুকে রাঙা পা ফেলে সে যেন নেচে চলে। তার একরাশি চুল নিয়ে বাতাস খেলা করে।

সেই বনের পথে হঠাৎ একদিন এক রাজার ছেলে এল ঘোড়ায় চড়ে। ফুলের দেশের রাজকন্যা মানুষের মুখ অনেক কাল পরে দেখলে। দূরে গাছের ফাঁক থেকে অবাক চোখে সে অনেকক্ষণ তার দিকে চেয়ে রইল। ভাবল, এ কী চমৎকার দেখতে! রাজার ছেলের জল-তেষ্টা পেয়েছিল। জলের খোঁজ করতে যাবে এমন সময় রাজকন্যা ফুলের গেলাসে ক'রে এক গেলাস মধু এনে তার সামনে ধরলে। এই অচেনা জায়গায় অমন ফুটফুটে সুন্দরী মেয়ে দেখে রাজপুত্র তো অবাক। এক নিশ্বাসে সবটুকু মধু খেয়ে ফেলে সে বললে, "তোমার নাম জানি না, কিন্তু তুমিই আমাকে বাঁচালে।"

মানুষের গলার স্বর যে এত মিষ্টি হয়, রাজকন্যার তা জানা ছিল না। সে একবার শুধু রাজার ছেলের মুখের দিকে চেয়ে মাথা নিচু ক'রে দাঁড়িয়ে রইল।

ক্রমে দুজনের মধ্যে ভারি ভাব হয়ে গেল। ফুলের বনে তারা দুজনে বেড়িয়ে

বেড়ায়; পাখিরা তাদের ফল জোগাড় করে এনে দেয়, আর সকাল-সন্ধ্যা গান শোনায়। তেষ্টা পেলে ফুলের মধু তারা পান করে। সুখের তাদের আর সীমা ছিল না। একদিন দুপুরে গাছের ছায়ায় ব'সে দুজনে গল্প করছে। রাজার ছেলে জিজ্ঞাসা করলে, "হাঁগো রাজকন্যা, তুমি এরকম একা এই বনে কত দিন থেকে আছ। তোমার বাবা মা সব গেলেন কোথায়।"

ফুলের দেশের রাজকন্যা এ কথার উত্তর কিছুতেই দিতে চায় না। সে কেবলই বলে, "কেন, আমরা দুটিতে তো বেশ সুখেই আছি, অত-সব খবর শুনে কেন আবার কষ্ট ডেকে আনতে যাওয়া।"

রাজপুত্র কিছুতেই ছাড়বে না। শেষে রাজার মেয়েকে হার মানতেই হল। সে বলতে লাগল, "অনেক দিন আগেকার কথা, আমি তখন নিতান্ত ছেলেমানুষ। মরুদেশের রাজার সঙ্গে আমার বাবার যুদ্ধ হয়েছিল। মার মুখে শুনেছিলাম, আমি দেখতে খুব সুন্দর ব'লে মরুরাজ আমায় তাঁর দেশে কেড়ে নিয়ে যেতে এসেছিলেন। মা তো ভেবে আকুল, খাওয়াদাওয়া প্রায় ছেড়ে দিলেন। আমিও সারাদিন খুব কাঁদতুম। আর কীই-বা করতে পারতুম তখন।

"বাবা সে যুদ্ধে হেরে গেলেন। মরুরাজের সৈন্যেরা আমাদের প্রাসাদ দিলে পুড়িয়ে। বাবা আর মাকে বন্দী ক'রে নিয়ে গেল মরুদেশে। আমাদের এক পুরনো দাসী ইতিমধ্যে আমাকে লুকিয়ে রেখে এল বাইরের বনে একরাশ পলাশ ফুলের ভিতর। বনের পাখিদের ব'লে এল আমায় দেখতে। ফুলের গাদার ভিতর আমি চোখ বুজে পড়ে রইলুম। তার পরে আর কিছুই মনে পড়ে না। ভোরে চোখ মেলে দেখি, কেউ কোথাও নেই। বুঝলুম, আমাকে এই ফুলের বনে একা থাকতে হবে। পাখিগুলো আমাকে কত যত্নই না করেছে তার পর থেকে।"

রাজপুত্র সমস্ত শুনে ভাবতে লাগল, এ যেন এক সত্যিকারের রূপকথা। মনে মনে ঠিক করল, যেমন ক'রে পারে ফুলের দেশের রাজা ও রানীকে সে আনবেই ফিরিয়ে। রাজকন্যাকে সে জিজ্ঞেস করলে, মরুদেশ সেই বনের কোন্ দিকে আর কত দূরে। রাজার মেয়ে রাজপুত্রের মতলব বুঝতে পেরে ভীষণ ভয় পেল। বললে,

"তুমি কিছুতেই সেখানে যেতে পাবে না।"

রাজার ছেলে উঠে দাঁড়াল, নিজের চক্‌চকে ধারালো তলোয়ারখানা ভালো ক'রে কোমরে বাঁধল, তার পর এক লাফে ঘোড়ায় চ'ড়ে বললে, "আমরা যে ক্ষত্রিয়, আমাদের ভয় পেলে চলে না। আমি নিশ্চয়ই তোমার বাবা আর মাকে ফিরিয়ে আনব।"

রাজকুমারীর দু চোখ বেয়ে ঝর্‌ঝরিয়ে জল ঝরতে লাগল, কে বলবে সে জল দুঃখের কি আনন্দের। আঁচল ভ'রে ঝরা ফুলের পাপড়ি এনে সে রাজপুত্রের পিঠের একটা তূণ ভ'রে দিলে। তার পর কাছে এসে মুখ তুলে বললে, "আমি কিন্তু তোমার পথ চেয়ে ব'সে রইলাম। সঙ্গে যে ফুলের পাপড়ি দিলাম ওগুলো জাদু-করা; রোজ সকালে একমুঠো করে নিয়ে বাতাসে উড়িয়ে দিয়ো। ওরাই আমাকে তোমার খবর এনে দেবে। মনে থাকবে তো?"

রাজার ছেলে ঘাড় নেড়ে বললে, "খুব মনে থাকবে। তুমি কিন্তু তা ব'লে কাঁদতে পারবে না। আমাকে হাসিমুখে বিদায় দাও।"

রাজকন্যা অনেক চেষ্টা ক'রে ঠোঁটের কোণে একটু হাসি টেনে আনল। চোখ দুটিতে তার তখনও মুক্তোর মতো বড়ো বড়ো দুটি ফোঁটা জল দুলছে। রাজার ছেলে মরুদেশের দিকে তীরের বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

পরদিন ভোর না হ'তেই নানান্‌ রঙের একপাল প্রজাপতি উড়ে এল সেই ফুলের বনে। তাদের দেখে মনে হয় যেন কে একমুঠো জ্যান্ত ফুলের পাপড়ি হাওয়ায় ছড়িয়ে দিয়েছে। ফুলের দেশের রাজকন্যা দেখেই বুঝলে, রাজপুত্র এদের পাঠিয়েছে। চোখের জল আর সে থামিয়ে রাখতে পারে না।

আজও ভোর না হ'তেই প্রজাপতিরা সেই রাজপুত্রেরই খবর ফুলের দেশের রাজকুমারীর কানে কানে চুপি চুপি ব'লে যায়। তার কথা স্মরণ ক'রে আজও ভোরে রাজার মেয়ের চোখের পাতায় ফোঁটা ফোঁটা জল দেখা দেয়। জানি না, সে কোন্‌ ভোরে রাজার ছেলে নিজে আবার ফুলের দেশে ফিরে আসবে!

চুম্বকের ব্যবহার

মানুষ বুদ্ধি খাটিয়ে অনেক নতুন নতুন কথা জেনেছে, আর অনেক নতুন জিনিস বের করেছে। যে-সব জিনিস বের করেছে তা মানুষ যে কত কাজে লাগাচ্ছে তার খবর নিলে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়। চুম্বক ঐরকমের একটা জিনিস।

ছুরির ফলার একেবারে ডগা কোনো লোহার ছুঁচ কি আলপিনের গায়ে ঠেকালে অনেক সময় দেখা যায় যে, সেই ছুঁচ কি আলপিন ছুরিটার ডগায় ঝুলে থাকে। দেখে অবাক হয়ে যেতে হয়। ছুঁচটা ছুরি থেকে আলাদা করতে গিয়ে আবার দেখি যে একটু জোরও লাগে। এর কারণ কারও কাছে জানতে গেলে সে হয়তো বলবে যে, ও ছুরির ফলাটা চুম্বক। ছুরি ছুঁচটাকে যেন চুম্বন করছে। আসলে একখানা চুম্বকের ছোঁয়াচ লেগে ইস্পাতের ছুরি চুম্বকের গুণ পেয়েছে।

আমরা একটা জিনিস যখন ধ'রে থাকি তখন হয় সেটা হাত দিয়ে ধরি, নয়তো শিকল দিয়ে কি দড়ি দিয়ে বেঁধে সে জিনিসটা তুলি কি টানি। যে জোরটা কাজে লাগাচ্ছি তা হয়তো হাত কিংবা অন্য কোনো জিনিসের ভিতর দিয়ে চালিয়ে দিই। মোট কথা, জোর কিসের ভিতর দিয়ে কাজ করছে তা দেখতে পাই, বুঝি। চুম্বকের বেলায় এই জোর খাটানোর জিনিসটা চোখে দেখি না ব'লে অবাক হয়ে থাকি।

আমরা তো আজকাল বড়ো বড়ো ভীষণ ভারী লোহার জিনিস চার ধারেই দেখি। এদের কেমন ক'রে এক জায়গা থেকে আর-এক জায়গায় নেয় আমরা ভেবে স্থির করতে পারি না। খুব বড়ো বড়ো লোহার কারখানাতে গেলে দেখা যাবে যে, নশো কি হাজার মোন ভারী একটা বিরাট লোহার বোঝা আমাদের মাথার উপর দিয়ে ঝুলতে ঝুলতে ফস্ ক'রে কারখানার এক ধার থেকে আর-এক ধারে চলে যাচ্ছে। মানুষ নেই, ঘোড়া নেই, দড়ি নেই, শিকল নেই, চেঁচামেচি নেই, গাছের পাতার ভিতর মৃদু হাওয়া ব'য়ে গেলে যতটুকু আওয়াজ হয় প্রায় ততটুকু আওয়াজ ক'রেই অতবড়ো বিরাটকায় একটা লোহার পাহাড় অনায়াসে এক জায়গা থেকে আর-এক জায়গায় চলে যাচ্ছে।

আর এই চালানো ব্যাপারটা চলছে শুধু একটা প্রকাণ্ড চুম্বকের জোরে। সারসের গলার মতো লম্বা গলা বাড়িয়ে একটা লোহার দৈত্য যেন দাঁড়িয়ে আছে। তারই ঠোঁটে ঝোলানো রয়েছে একটা বিদ্যুৎ-চুম্বক, শক্ত তার বা শিকল দিয়ে। এই বিদ্যুৎ-চুম্বকটা কী। ৫।৬ ইঞ্চি ব্যাসের নরম লোহার প্রকাণ্ড একটা ডাণ্ডা তামার তার দিয়ে পেঁচানো হয়। এই তারের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ চালালেই লোহার ডাণ্ডা জোরালো চুম্বক হয়ে যায়। বিদ্যুৎ যতক্ষণ তারের ভিতর দিয়ে চলতে থাকবে লোহাটা ততক্ষণই থাকবে চুম্বক হয়ে। বিদ্যুৎ-চলাচল বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লোহার মধ্যেকার চুম্বকের শক্তি যাবে নষ্ট হয়ে। এইরকম তার-জড়ানো কতকগুলি নরম লোহার ডাণ্ডার সঙ্গে একটা লোহার চাপ আঁটা থাকে। ইস্পাতের ঢিবির উপর এই লোহার চাপটা ঠেকানো মাত্র একজন লোক তামার তারের ভিতর বিদ্যুৎ চালিয়ে দেবার সুইচ দেয় টিপে। তারের ভিতর বিদ্যুতের প্রবাহ যেই চলা অমনি মুহূর্তের মধ্যে ইস্পাতের ঢিবিটা জুড়ে যায় চুম্বকের চাপের সঙ্গে। তখন তাকে যেখানে নেবার নিয়ে ফেলে সুইচ টিপে বিদ্যুৎ-প্রবাহ বন্ধ করলেই চুম্বক চোখের পলক পড়তে না-পড়তে দেয় সে ভারী বোঝা ছেড়ে। তার থেকে বিদ্যুতের চলা বন্ধ ক'রে দেবা মাত্র চুম্বক আর চুম্বক রইল না ; তাই তার টান গেল ফস্কে, আর ইস্পাতের বোঝাও পেল মুক্তি। এমনি করে এক জায়গার ঢিবি অনায়াসে আর-এক জায়গায় নিয়ে ফেলা যায়।

এঞ্জিন আর এমনিতরো বড়ো বড়ো লোহার কলকব্জা পুরানো হয়ে যখন বাতিল-করা লোহার শামিল হয়ে পড়ে, তখন তাদের একেবারে গুঁড়িয়ে ফেলে নতুন ক'রে আবার ইস্পাত তৈরি হয়। এই বাতিল-করা লোহা গুঁড়িয়ে ফেলবার জন্য একটা বিরাট লোহার গোলা রাখা হয়। তার ওজন হয় দেড়শো মোনেরও উপর। বিদ্যুৎ-চুম্বকের তলায় ঐ গোলাটা লেগে থাকে। তার পর যেখানে সব পুরানো কলকব্জার ঢিবি, ঠিক তার উপরে গোলাটাকে এনে সুইচ টিপে দিয়ে তারের মধ্যে বিদ্যুতের চলাচল বন্ধ ক'রে দিলেই গোলাটা গিয়ে পড়ে সেই নীচের ঢিবির উপর। এক সময়ে যে-সব কলকব্জা দৈত্যের মতো শক্তি ধরত তাদের খুলি দেয় ভেঙে চুরমার ক'রে। এই বিপুল লোহার গোলার নাম হয়েছে 'খুলি-ফাটিয়ে' (**skull cracker**)।

বিদ্যুৎ-চুম্বকের সাহায্যে অত্যন্ত ভারী বোঝা এক জায়গা থেকে আর-এক জায়গায় অতি সহজে নিয়ে যাবার কথা বলা হল। বিদ্যুৎ-চুম্বকের আরও কয়েক-রকম ব্যবহারের কথা সংক্ষেপে বলা যাক।

বিদ্যুৎ-পাখা, কলিং বেল, টেলিফোন ও রেডিয়োতে এই চুম্বকের শক্তিই কাজ করে।

নৌযুদ্ধে ও নানাবিধ প্রাকৃতিক দুর্যোগে বড়ো বড়ো জাহাজ সমুদ্রের মধ্যে ডুবে যায়। এক সময় ছিল যখন এ-সব জাহাজ জলের নীচে থেকে খুঁজে তোলা অত্যন্ত দুঃসাধ্য ছিল। কোটি কোটি টাকার জাহাজ নষ্ট হয়ে যেত। এখন বিদ্যুৎ-চুম্বকের সাহায্যে এরকম জাহাজ খুঁজে পাওয়া ও উদ্ধার করা অনেক সহজসাধ্য হয়েছে।

আমরা যে যুগে বাস করছি তাকে বলা হয় লোহার যুগ। লোহার কারখানায় কাজ করে এমন লোকের সংখ্যা আজকাল খুবই বেশি। কাজ করতে গিয়ে কত লোকের চোখের ভিতর লোহার গুঁড়ো ঢুকে যায়। আগে অস্ত্রপ্রয়োগ ছাড়া এই গুঁড়ো বের করবার কোনো উপায় ছিল না। কিন্তু চোখে অস্ত্রপ্রয়োগ খুবই বিপজ্জনক ব'লে ডাক্তাররা সহসা এরকম অস্ত্রচিকিৎসা করতে পারতেন না। ফলে অনেকের চোখ চিরদিনের জন্য নষ্ট হয়ে যেত। এখন কারও চোখে লোহার গুঁড়ো ঢুকলে তৎক্ষণাৎ তাকে নিয়ে যাওয়া হয় নিকটবর্তী কোনো বড়ো হাসপাতালে। জোরালো বিদ্যুৎ-চুম্বকের কাছে চোখ ধরবামাত্র চুম্বকের টানে লোহার গুঁড়ো আসে বেরিয়ে। ডাক্তার অনেক তোড়জোড় ক'রে চোখ কেটেও যে কাজ নির্বিঘ্নে সমাধা করতে পারবেন কিনা সন্দেহ করতেন সে কাজ এখন হয়ে যাচ্ছে মুহূর্তের মধ্যেই অনায়াসে ও নিরাপদে।

বৃষ্টি রৌদ্র

ঝুঁটি বাঁধা ডাকাত সেজে
দল বেঁধে মেঘ চলেছে যে
আজকে সারা বেলা।
কালো ঝাঁপির মধ্যে ভ'রে
সূর্যকে নেয় চুরি ক'রে—
ভয় দেখাবার খেলা।
বাতাস তাদের ধরতে মিছে
হাঁপিয়ে ছোটে পিছে পিছে,
যায় না তাদের ধরা।
আজ যেন ওই জড়োসড়ো
আকাশ জুড়ে মস্ত বড়ো
মন-কেমন-করা।
বটের ডালে ডানা-ভিজে
কাক ব'সে ওই ভাবছে কী যে,
চড়ুইগুলো চুপ।
বৃষ্টি হয়ে গেছে ভোরে,
শজনেপাতায় ঝ'রে ঝ'রে
জল পড়ে টুপ্ টুপ্।

লেজের মধ্যে মাথা থুয়ে
খাঁদন কুকুর আছে শুয়ে
কেমন একরকম।
দালানটাতে ঘুরে ঘুরে
পায়রাগুলো কাঁদন-সুরে
ডাকছে বক্‌বকম্।
কার্তিকে ওই ধানের খেতে
ভিজে হাওয়া উঠল মেতে
সবুজ ঢেউয়ের 'পরে।
পরশ লেগে দিশে দিশে
হি হি ক'রে ধানের শিষে
শীতের কাঁপন ধরে।
ঘোষালপাড়ার লক্ষ্মী বুড়ি
ছেঁড়া কাঁথায় মুড়িসুড়ি
গেছে পুকুর-পাড়ে—
দেখতে ভালো পায় না চোখে,
বিড়্‌বিড়িয়ে ব'কে ব'কে
শাক তোলে, ঘাড় নাড়ে।

ওই ঝমাঝম্ বৃষ্টি নামে,
মাঠের পারে দূরের গ্রামে
ঝাপ্‌সা বাঁশের বন।
গোরুটা কার থেকে থেকে
খোঁটায়-বাঁধা উঠছে ডেকে,
ভিজছে সারাক্ষণ।

গদাই কুমোর অনেক ভোরে
সাজিয়ে নিয়ে উঁচু ক'রে
হাঁড়ির উপর হাঁড়ি।
চলছে রবিবারের হাটে
গামছা মাথায় জলের ছাঁটে
হাঁকিয়ে গোরুর গাড়ি।
বন্ধ আমার রইল খেলা,
ছুটির দিনে সারা বেলা
কাটবে কেমন ক'রে।
মনে হচ্ছে এম্‌নিতরো
ঝরবে বৃষ্টি ঝরোঝরো
দিনরাত্তির ধ'রে।

ট্রিস্ট্যান ডা কুন্হা ॥ ২ ॥

একশো ত্রিশ বছরের চেষ্টায় ট্রিস্ট্যানের লোকেরা কতটুকু উন্নতি করতে পেরেছে, তার একটা ছবি পাওয়া গেছে একজন ভ্রমণকারীর বিবরণ থেকে।

দ্বীপটা তো পাথরের, সবটা মিলেই একটা খাড়া পর্বত। লোকজন বাড়ি করল কোথায়! পর্বতের গায়ে সমুদ্রের জল থেকে দুশো ফুট উঁচুতে খানিকটা জায়গা আছে, লম্বায় মাইল পাঁচেক আর চওড়ায় মাত্র এক মাইল। এই জায়গাটাই সমস্ত দ্বীপের মধ্যে একমাত্র সমতল ভূমি। যা-কিছু বাড়িঘর লোকজন এরই মধ্যে।

পাঁচ মাইল লম্বা এক মাইল চওড়া জায়গা তো পৃথিবীর যে-কোনো একটা মাঝারি গোছের শহরের সমান। অথচ ট্রিস্ট্যান দেশটা বলতে গেলে ওরই মধ্যে রয়ে গেছে। সমস্ত দেশটার লোকসংখ্যা মাত্র দুশো, ছেলে মেয়ে ও কোলের শিশু সব ধ'রে। শুনলে লোকের হাসি পায়। যে-কোনো একটা গাঁয়েও এর চেয়ে বেশি লোক থাকে। রেলগাড়ি, মোটর, ঘোড়ার গাড়ি, ট্রাম— এ-সব কিছুই নেই। পাকা রাস্তা নেই, নর্দমা নেই, রাস্তায় আলো নেই। দোকান নেই, বাজার নেই। বায়স্কোপ নেই, থিয়েটার নেই, এটা যেমন দুঃখের কথা— তেমনি আনন্দের কথা, ইস্কুল নেই, মাস্টারমশাই নেই। একটা দেশ, তাতে পুলিস নেই, জেলখানা নেই। কী আছে তা হলে, তাই শুনতে ইচ্ছা করে।

কী আছে জানবার আগে একটা কথা ভাবতে হবে, এ দ্বীপের নিজস্ব কোনো ঐশ্বর্য নেই। মাটি নেই যে ফসল জন্মানো যাবে। সমুদ্র দিয়ে ঘেরা, তাও আবার তীর-ভূমি প্রস্তরময়। চার ধারে দু মাইল চওড়া একটা জলের চাদর, ঢেকে রেখেছে তীরব্যাপী অখণ্ড পাথর। এ দু মাইলের মধ্যে জাহাজ আসবার জো নেই। না জেনে এসেছে যত জাহাজ সবই ভেঙে চুরমার হয়েছে। বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে নিয়মিত যোগ রাখা এ দেশের পক্ষে এখনো সম্ভব হয় নি। জানা গেছে একবার একখানা জাহাজ ষোলো দিন ধ'রে দ্বীপের চার ধারে ঘুরতে থাকে। মেঘ ও কুয়াশার পর্দা উঠে গেলে তবে জাহাজখানা ভিড়ল। দ্বীপে লোভনীয় যদি কিছু থাকত, জাহাজ ভিড়বার ব্যবস্থাও এত দিনে হয়ে যেত। এ অবস্থায় মানুষ যা করতে পারে তাই ভেবে এ দেশের উন্নতির হিসেব নিতে হবে।

ঘরবাড়ির কথা আগেই একরকম বলা হয়েছে। কিছু বাড়ি আছে ভাঙা

জাহাজের কাঠ দিয়ে তৈরি। বেশির ভাগ বাড়িরই দেয়াল পাথরের আর চাল শণ-কাঠির। এই গাছই দ্বীপের একমাত্র নাম করবার মতো গাছ, প্রচুর হয়। ফলমূল বলতে আপেল আর আলু, তাও খুব অল্প। সমুদ্রের কূলে জায়গায় জায়গায় একটু-আধটু গুহাগহ্বর যা আছে তাতে অল্প পলিমাটি জমে। অনেক কষ্টে সেই-সব জায়গায় কিছু আপেল গাছ আর অল্প কিছু আলুর খেত করা গেছে। আর এই দ্বীপের প্রতিবেশী বলতে প্রায় পঁচিশ মাইল দূরে দু-চারটি আরো ছোট্ট ছোট্ট দ্বীপ আছে। তাতে সহস্র সহস্র পেঙ্গুইন এবং অন্যান্য পাখি নিরুপদ্রবে বাস করে। ট্রিস্ট্যান থেকে ঝড়-ঝঞ্ঝা কাটিয়ে দু-চারখানা নৌকো বছরে দু-চারবার এই-সব দ্বীপে যায়, সংগ্রহ ক'রে আনে পাখি এবং পেঙ্গুইন ও অন্যান্য পাখির ডিম। আর সংগ্রহ করে ঐ-সব দ্বীপের কূলে-জড়ো-হয়ে-থাকা ভাঙা জাহাজ বা নৌকোর যত ভেসে-বেড়ানো কাঠের খণ্ড। সমুদ্রের পাখি, মাছ, আর এক-জাতীয় গলদা চিংড়ি, এও কিছু কিছু ধরা পড়ে। গৃহপালিত পশু বলতে আছে কতকগুলি হাঁস, মুরগি, শুয়োর, কুকুর, ভেড়া, গোরু ও গাধা। ফুরিয়ে গেল এ দেশের সম্পদের তালিকা। পরিমাণে এ সম্পদ এত বেশি নয় যে, বিদেশী বণিকের সঙ্গে বাণিজ্য চলে। মোট নাকি সাতশোটি ভেড়া আছে। তাদের লোম থেকে গাত্রবস্ত্র এরা নিজেরাই তৈরি ক'রে নেয়। মাটির বুক থেকে সম্পদ লাভ করা এদের অদৃষ্টে নেই, ভেড়ার গায়ে যে সম্পদ তাই দিয়ে একটা প্রধান অভাব এরা ঘুচিয়ে নেয়।

এইটুকু বিবরণ থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে, বেঁচে থাকাটাই এদের কাছে সব চেয়ে বড়ো কথা। বায়স্কোপ, থিয়েটার এবং মানুষের উপভোগ্য অন্যান্য ঐশ্বর্য এদের ভাগ্যে এখনো ঘটে নি। বাইরের জগৎকে এরা তেমন কিছু দিতে পারে না, তাই বাইরে থেকে পায়ও এরা খুব কম। দক্ষিণ-আফ্রিকার কেপ্ কলোনিতে একটা সমিতি আছে ট্রিস্ট্যানের লোকদের কখনো কখনো সাহায্য করবার জন্য। বছরে হয়তো একবার ক'রে জাহাজ আসে। তাতেই আসে চিঠিপত্র, নিতান্ত প্রয়োজনীয় কিছু-কিছু খাদ্য-দ্রব্য এবং অল্প কিছু অন্য জিনিস।

আগেই বলা হয়েছে, হাট-বাজার নেই। একটা ভাণ্ডার আছে। সেখানে আলু,

ডিম, কাপড়চোপড়, চাষের জন্য দরকারি যন্ত্রপাতি, সবই জড়ো করা থাকে। জাহাজ থেকে পাওয়া ময়দা, চিনি, টিনে-রাখা মাংস ও ফল, সাবান, কাপড়, ওষুধপত্র, লবণ, চা, তামাক, মোমবাতি এবং কিছু কিছু অস্ত্রশস্ত্র— এ-সবও ঐ ভাণ্ডারেই রাখা হয়। সেখান থেকে দরকারমত জিনিস লোকেরা যাতে পেতে পারে তার ব্যবস্থা আছে। টাকাকড়ির কারবার এ দ্বীপে নেই। গোরুর গাড়ি দু-চারখানাই আছে। মাসে দুবার ক'রে খাবার জিনিস এরই একখানা গাড়িতে ক'রে বাড়ি বাড়ি বিলিয়ে দেওয়া হয়। মাংস, লবণ, চিনি, চা, তামাক, এ-সব বিলাসের সামগ্রী। দ্বীপের যিনি প্রধান পুরোহিত তিনিই হচ্ছেন প্রধান শাসনকর্তা। তিনি দরকার বুঝে হিসেব ক'রে বিলাসের দ্রব্য বিলি করেন।

পর্বতের বড়ো বড়ো পাথরের ফাঁকে ফাঁকে যে অল্পস্বল্প ঘাস জন্মে, তাই খেয়েই গোরু ভেড়া গাধা এরা বেঁচে থাকে। গোরুর দুধ এখানকার প্রধান পানীয়। মদ এ দেশে নেই। প্রধান খাদ্য আলুসিদ্ধ। মাংস অনেক দিন অন্তর অন্তর। একমাত্র বড়োদিনের সময় পোষা ভেড়ার মাংস খাওয়া বিধি। ডিম ও মাছ মাংসের চাইতে একটু ঘন ঘন। আমরা ভাত ও রুটির সঙ্গে ডাল তরকারি মাছ বা মাংস মিশিয়ে খাই। ওখানে এক পদের সঙ্গে আর-এক পদ মিশিয়ে খাওয়া ভাগ্যে ঘ'টে ওঠে না।

এ দেশের লোকের মোটামুটি খাওয়া পরা ও থাকার কথা খানিকটা জানা গেল। এইবার এদের সম্বন্ধে আর দু-চারটি জানবার মতো কথা বলেই কাহিনী শেষ করা যাবে। ইংলণ্ডের রাজা স্বর্গীয় পঞ্চম জর্জ এদের একটা গ্রামোফোন উপহার দিয়েছিলেন। সপ্তাহে একদিন ক'রে সকলে এক জায়গায় জড়ো হয়ে তার গানবাজনা শোনে। দ্বীপে একটিমাত্র হারমোনিয়াম আছে, সেও রাজার দান। সেটা থাকে গির্জায়। কেপ্ কলোনির খ্রিস্ট্যান-সাহায্য সমিতির আবেদনের ফলে পাওয়া গেছে একটা রেডিয়ো। এখন লোকেরা পৃথিবীর অন্য লোকের গলাও একটু শুনতে পায়। দেশ-বিদেশের খবরও কিছু পায়। একটা কথা বলা দরকার। নানা দেশের নানাভাষী লোক জুটেছিল এই দ্বীপে, এখন তারা সকলেই ইংরেজি ভাষা বলে।

ইস্কুল নেই ব'লে সকলেই যে নিরক্ষর তা নয়। যে বাড়িটাতে ভাণ্ডার রক্ষিত

হয়, সেই বাড়িতেই কিছু বই থাকে। প্রধান পুরোহিত যিনি, তাঁর উপর অনেক-কিছুর ভার। তিনি একলাই শিক্ষক, পোস্ট্‌মাস্টার, বিচারক ও শাসনকর্তা। তাঁর শিক্ষার ফলে অনেকেই কিছু কিছু লেখাপড়া করতে পারে। তবে সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করতে হয়, রাত্রিতে ছাড়া পড়বার সময় নেই। তাও আবার আলো জ্বালাবার তেলের টানাটানি। বড়োদিন ও অন্যান্য দু-চারটি রাতে বিদেশ থেকে আমদানি-করা মোমবাতি জ্বালানো হয়। অন্য সময়ে এক-জাতীয় সিন্ধুঘোটক মেরে তার দেহ থেকে যে তেল পাওয়া যায় তাই আলোয় ব্যবহার করা হয়। এইজন্য রাত্রিতে পড়াশুনা করতে গিয়ে বেশি তেল পোড়ানো চলে না। কয়েক বৎসর হল সমুদ্রগামী জাহাজগুলিকে সতর্ক করবার জন্য ট্রিস্ট্যানে একটা আলোকস্তম্ভ স্থাপন করা হয়েছে, তাতে সারারাত আলো জ্বলে। সেখানেও সিন্ধুঘোটকের তেল পোড়ানো হয়।

কাহিনী এইবার ফুরোল। মনের চোখে একটা নূতন দেশ দেখে আসা হল। আমরা যেমন থাকি, এ দেশের লোকেরা তার থেকে একেবারে আলাদা। এদের কথা জেনে একটা কথা সব চেয়ে বেশি মনে পড়ে। সে কথাটা এই যে, দেশের মাটি, বনজঙ্গল, গাছপালা জন্তুজানোয়ার এবং আবহাওয়া, এ-সবের সঙ্গে আমাদের বেঁচে থাকার কাজ ও আমোদ-প্রমোদ বেমালুম জড়িয়ে আছে। শোনা যায় পৃথিবীতে মানুষের জীবনযাত্রা প্রথম যখন শুরু হয়েছিল তখন তাকে অনেক ভেবেচিন্তে বাঁচতে হত। এখনো যে তাকে সেইরকম ভাবনাই ভাবতে হয়, ট্রিস্ট্যানের লোকদের কথা না শুনলে তা বিশ্বাস হত না। তারা যেন মানুষের প্রাচীন যুগের জীবন কেমন ছিল তা বুঝে নেবার জন্যই কোমর বেঁধে লেগেছে। মাত্র দুশো জন লোক, দক্ষিণ-আফ্রিকায় তাদের থাকবার ব্যবস্থা করে দেওয়া যাবে, এ কথা অনেকবার ইংরেজ-রাজ তাদের জানিয়েছিলেন। তারা কিন্তু তাতে রাজি হল না। ঐ দ্বীপের মায়া তারা ছাড়তে পারে নি। ওখানকার হাওয়ার গর্জন, পাথরের কৃপণতা, আর সমুদ্রের কঠোর শাসন— এ-সব ওরা মেনে নিয়েই ওখানে থাকবে বলে পণ করেছে। ওরা বোধ হয় ভেবেছে প্রকৃতির উপর মানুষের জয় হবেই হবে।

ঝড়

দেখ্ রে চেয়ে নামল বুঝি ঝড়,
ঘাটের পথে বাঁশের শাখা ওই করে ধড়্ফড়্।
আকাশ-তলে বজ্রপাণির ডঙ্কা উঠল বাজি,
শীঘ্র তরী বেয়ে চল্ রে মাঝি।
ঢেউয়ের গায়ে ঢেউগুলো সব গড়ায় ফুলে ফুলে,
পুবের চরে কাশের মাথা উঠছে দুলে দুলে।
ঈশান কোণে উড়্তি বালি আকাশখানা ছেয়ে
হু হু ক'রে আসছে ছুটে ধেয়ে।
কাকগুলো তার আগে আগে উড়ছে প্রাণের ডরে,
হার মেনে শেষ আছাড় খেয়ে পড়ে মাটির 'পরে।
হাওয়ার বিষম ধাক্কা তাদের লাগছে ক্ষণে ক্ষণে,
উঠছে পড়ছে, পাখার ঝাপট দিতেছে প্রাণপণে।
বিজলী ধায় দাঁত মেলে তার ডাকিনীটার মতো,
দিক্‌দিগন্ত চম্‌কে ওঠে হঠাৎ মর্মাহত।

ওই রে মাঝি, খেপ্‌ল গাঙের জল,
লগি দিয়ে ঠেকা নৌকো, চরের কোলে চল্।
সেই যেখানে জলের শাখা, চখাচখীর বাস,
হেথা-হোথায় পলিমাটি দিয়েছে আশ্বাস
কাঁচা সবুজ নতুন ঘাসে ঘেরা।
তলের চরে বালুতে রোদ পোহায় কচ্ছপেরা।
হোথায় জেলে বাঁশ টাঙিয়ে শুকোতে দেয় জাল,
ডিঙির ছাতে ব'সে ব'সে সেলাই করে পাল।
রাত কাটাব, ওইখানেতেই করব রাঁধাবাড়া—
এখনি আজ নেই তো যাবার তাড়া।
ভোর থাকতে কাক ডাকতেই নৌকো দেব ছাড়ি,
ইটেখোলার মেলায় দেব সকাল-সকাল পাড়ি॥

গেছো বাবা

উধো। কি রে সন্ধান পেলি?

গোবরা। আরে ভাই, তোমার কথা শুনে আজ মাসখানেক ধ'রে বনে-বাদাড়ে ঘুরে ঘুরে হাড় মাটি হল, টিকিও দেখতে পেলুম না।

পঞ্চু। কার সন্ধান করছিস রে।

গোবরা। গেছো বাবার।

পঞ্চু। গেছো বাবা! সে আবার কে রে।

উধো। জানিস নে? বিশ্বসুদ্ধ লোক তাকে জানে!

পঞ্চু। তা, গেছো বাবার ব্যাপারটা কী শুনি।

উধো। বাবা যে-গাছে চ'ড়ে বসবে সেই গাছই হবে কল্পতরু। তলায় দাঁড়িয়ে হাত পাতলেই যা চাইবি তাই পাবি রে।

পঞ্চু। খবর পেলি কার কাছ থেকে।

উধো। ধোকড় গাঁয়ের ভেকু সর্দারের কাছ থেকে। বাবা সেদিন ডুমুর গাছে চ'ড়ে ব'সে পা দোলাচ্ছিল। ভেকু জানে না, তলা দিয়ে যাচ্ছে, মাথায় ছিল এক হাঁড়ি চিটেগুড়— তামাক তৈরি করবে। বাবার পায়ে ঠেকে তার হাঁড়ি গেল ট'লে— চিটেগুড়ে তার মুখ চোখ গেল বুজে। বাবার দয়ার শরীর; বললে, ভেকু, তোর মনের কামনা কী খুলে বল্। ভেকুটা বোকা; বললে, বাবা, একখানা ট্যানা দাও, মুখটা মুছে ফেলি। যেমনি বলা অমনি গাছ থেকে খসে পড়ল একখানা গামছা। মুখ চোখ মুছে উপরে যখন তাকালো তখন আর কারো দেখা নেই। যা চাইবে কেবল একবার। বাস্, তার পর কেঁদে আকাশ ফাটালেও সাড়া মিলবে না।

পঞ্চু। হায় রে হায়, শাল নয়— দোশালা নয়, শুধু একখানা গামছা! ভেকুর আর বুদ্ধি কত হবে।

উধো। তা হোক। ঐ গামছা নিয়েই তার দিব্যি চ'লে যাচ্ছে— দেখিস নি রথতলার কাছে অত বড়ো আটচালা বানিয়েছে? গামছা হোক, বাবার গামছা তো।

পঞ্চু। কী ক'রে হল। ভেলকি নাকি।

উধো। হোঁদলপাড়ার মেলায় ভেকু সেদিন বাবার গামছা পেতে বসল। হাজারে হাজারে লোক এসে জুটল। বাবার নামে টাকাটা সিকেটা আলুটা মুলোটা চার দিক থেকে গামছার উপর পড়তে লাগল। মেয়েরা কেউ-বা এসে বলে, ও ভেকুদাদা, আমার ছেলেটার মাথায় বাবার গামছা একটু ঠেকিয়ে দে, আজ তিন মাস ধ'রে জ্বরে ভুগছে। ওর নিয়ম হচ্ছে, নৈবিদ্যি চাই— পাঁচ সিকে, পাঁচটা সুপুরি, পাঁচ কুন্‌কে চাল, পাঁচ ছটাক ঘি।

পঞ্চু। নৈবিদ্যি তো দিচ্ছে, ফল পাচ্ছে কিছু ?

উধো। পাচ্ছে বৈকি। গাজন পাল গামছা ভ'রে পনেরো দিন ধ'রে ধান ঢেলেছে, তার পরে ঐ গামছার কোণে দড়ি লাগিয়ে একটা পাঁঠাও দিলে বেঁধে, ঐ পাঁঠার ডাকে চার দিক থেকে লোক এসে জমল। কী বলব ভাই, মাস-এগারো পরেই গাজনের চাকরি জুটে গেল। আমাদের রাজবাড়ির কোতোয়ালের সিদ্ধি ঘোঁটে, তার দাড়ি চুমরিয়ে দেয়।

পঞ্চু। সত্যি বলছিস ?

উধো। সত্যি না তো কী! গাজন যে আমার মামাতো ভায়ের ভায়রা-ভাই হয়।

পঞ্চু। আচ্ছা ভাই উধো, গামছাটা তুই দেখেছিস ?

উধো। দেখেছি বৈকি। হট্টুগঞ্জের তাঁতে দেড় গজ ওসারের যে গামছা বুনুনি হয়, চাঁপার বরন জমি, লাল পাড়, একেবারে বেমালুম তাই।

পঞ্চু। বলিস কী! তা সে গাছের উপর থেকে পড়ল কী ক'রে।

উধো। ঐ তো মজা। বাবার দয়া।

পঞ্চু। চল্‌ ভাই, চল্‌, খোঁজ করতে বেরই। কিন্তু চিনব কী করে।

উধো। সেই তো মুশকিল। কেউ তো তাকে দেখে নি। আরার হবি তো হ, ভেকু বেটার চোখ গেল চিটেগুড়ে বুজে।

পঞ্চু। তবে উপায় ?

উধো। আমি তো হাটে ঘাটে যাকে দেখছি তাকে জোড়হাত করে জিগেস করছি, দয়া ক'রে জানাও, তুমিই কি গেছো বাবা। শুনে তারা তেড়ে মারতে আসে। একজন তো দিল আমার মাথায় হুঁকোর জল ঢেলে।

গোবরা। তা দিক গে। ছাড়া হবে না। খুঁজে বের করবই। যা থাকে কপালে। ভেকু বলে, গাছে চড়লেই তবে বাবার চেহারা ধরা পড়ে, যখন নীচে থাকেন চেনবার জো নেই।

উধো। গাছে চড়িয়ে মানুষকে পরখ করব কী ক'রে ভাই। আমি এক বুদ্ধি করেছি। আমার আমড়া গাছ আমড়ায় ভ'রে গেছে, যাকে দেখছি তাকেই বলছি, আমড়া পেড়ে নাও— গাছটা প্রায় খালি হয়ে এল, ডালগুলোও ভেঙেছে।

পঞ্চু। আর দেরি নয় রে, চল্‌। কপালের জোর যদি থাকে তবে দর্শন লাভ হবেই। একবার গলা ছেড়ে ডাক দে না ভাই— গেছো বাবা, ও বাবা, দয়াল বাবা, পারুলবনে কোথাও যদি থাকো লুকিয়ে, একবার অভাগাদের দর্শন দাও।

গোবরা। ওরে, হয়েছে রে, দয়া হল বুঝি।

পঞ্চু। কইরে, কই ?

গোবরা। ঐ যে চালতা গাছে।

পঞ্চু। কী রে চালতা গাছে, দেখছি নে তো কিছু।

গোবরা। ঐ যে দুলছে।

পঞ্চু। কী দুলছে। ও তো লেজ রে।

উধো। তোর কেমন বুদ্ধি গোবরা, ও বাবার লেজ নয় রে, হনুমানের লেজ। দেখছিস নে মুখ ভ্যাঙাচ্ছে ?

গোবরা। ঘোর কলি যে। বাবা ঐ কপিরূপ ধরেছেন— আমাদের ভোলাবার জন্যে।

পঞ্চু। ভুলছি নে বাবা, কালামুখ দেখিয়ে ভোলাতে পারবে না। যত পার মুখ ভ্যাঙাও, নড়ছি নে— তোমার ঐ শ্রীলেজের শরণ নিলুম।

গোবরা। ওরে, বাবা যে লম্বা লাফ দিয়ে পালাতে শুরু করল রে।

পঞ্চু। পালাবে কোথা। আমাদের ভক্তির দৌড়ের সঙ্গে পারবে কেন।

গোবরা। ঐ বসেছে কয়েৎ-বেল গাছের ডগায়।

উধো। পঞ্চু, উঠে পড়্-না গাছে।

পঞ্চু। আরে, তুই ওঠ্-না।

উধো। আরে, তুই ওঠ্।

পঞ্চু। অত উচ্চে উঠতে পারব না বাবা, কৃপা ক'রে নেমে এসো।

উধো। বাবা, তোমার ঐ শ্রীলেজ গলায় বেঁধে অন্তিমে যেন চক্ষু মুদতে পারি, এই আশীর্বাদ করো।

উড়ো জাহাজ

ওরে যন্ত্রের পাখি,
ওরে রে আগুন-খাকী,
এ কী ডানা মেলি,
আকাশেতে এলি—
কোন্ নামে তোরে ডাকি।

কোন্ রাক্ষুসে চিলে—
কী বিকট হাড়গিলে—
পেড়েছিল ডিম
প্রকাণ্ড ভীম,
তোরে সে জন্ম দিলে।

কোন্ বটে, কোন্ শালে,
কোন্ সে লোহার ডালে,
কী রকম গাছে
তোর বাসা আছে
দেখি নি তো কোনো কালে

যখন ভ্রমণ কর'
গান কেন নাহি ধর'
কোন্ ভূতে হায়
চাবুক কষায়,
গোঁ গোঁ ক'রে ক'রে মর'।

তোমার ও দুটো ডানা
মানুষের পোষ-মানা—
কলের খাঁচায়
তোমারে নাচায়,
তুমি বোবা, তুমি কানা।

হায় রে একি অদৃষ্ট,
কিছুই তো নহে মিষ্ট,
মানুষের সাথ
থাক' দিনরাত—
নাহি বল' রাধাকৃষ্ট।

যত হও নাকো বড়ো,
দাঁত কর' কড়োমড়ো,
তবু ভয়ে তোর
লাগিবে না ঘোর,
হব নাকো জড়োসড়ো।

মানুষেরে পিঠে ধরি
ঘোর' দিবা বিভাবরী,
আমরা দোয়েল
পাপিয়া কোয়েল
দূর হতে গড় করি।

কুকুর সম্বন্ধে দু-চার কথা

পোষ মানানো অবস্থায় পশুদের মানুষ অদ্ভুতরকম বদলে দিল কেমন ক'রে, তা একটু জানা গেলে পর, কয়েকটি কুকুর সম্বন্ধে দু-চার কথা বুঝতে সহজ হবে।

ফুল ও ফলের চাষ যারা করে তারা বীজ বেছে নেয়। এক বাগানে এক জাতের গোলাপ ফুলের অনেক গাছ হয়েছে, তবু সব গাছের ফুল গড়নে গন্ধে আকারে বর্ণে এক হয় না, এ তো সর্বদাই দেখা যায়। মালী পরের বৎসরের জন্য বীজ রাখে, তখন যে গাছের ফুল সব চেয়ে ভালো হয় সেই গাছের আবার সব চেয়ে ভালো ফুলটির বীজ রাখে। এর ফলে দেখা যায় যে, পরের বছরের ফুলগুলি আগের বছরের প্রায় সব ফুলের থেকেই ভালো হয়েছে। সেই ভালো ফুলের মধ্যে আবার যেটি সব চেয়ে ভালো, তার বীজ থেকে আরো পরের বৎসরের ফুলগুলি আরো ভালো হয়ে ওঠে। এমনি ক'রে বছরের পর বছর ফুল ক্রমেই ভালো হতে থাকে। মানুষ প্রথম যখন পশুদের গৃহে পালন করতে আরম্ভ করল তখন ঠিক এইরকমই করেছিল।

ধরা যাক নেকড়ের কথা। নানা সময়ে নানা স্থানে নানা জাতের নেকড়ে পোষা আরম্ভ হয়েছিল। নানা জাত বললেই বুঝতে হবে যে, তাদের অঙ্গের গঠন, চোখ কান নাক এ-সব ইন্দ্রিয়গুলির শক্তি, চালচলন, ভাবভঙ্গি এক কথায় স্বভাব বলতে যা বোঝায় সে-সবই নানারকমের। মানুষের মধ্যে যেমন দেখা যায়, একজন মানুষ আর-একজন মানুষের সঙ্গে সবরকমে মেলে না, নেকড়ের মধ্যেও ঠিক তেমনি। প্রত্যেকটা নেকড়ে অপর নেকড়ে থেকে একটু আলাদা হবেই। মানুষেরা তো এক সময়ে শিকার-করা জন্তুর মাংস খেয়েই বাঁচত। তখন তারা যদি এমন সহায় পায়, যে খুব জোর দৌড়তে পারে, তা হলে তো তাদের খুব সুবিধা। তাই সে যুগের পোষা নেকড়েদের মধ্যে যারা খুব দ্রুত দৌড়তে পারত তাদের অন্যদের থেকে আলাদা করে নেওয়া হত। প্রায়ই দেখা যেত, এদের বাচ্ছারা দৌড়ে অন্য বাচ্ছাদের হারিয়ে দিত। সেই-সব বাচ্ছারা বড়ো হলে তাদের মধ্যে যেগুলি সব চেয়ে দ্রুত দৌড়ত, তাদের আবার অন্যদের থেকে আলাদা করে পালন করা হত। এদের যে-সব বাচ্ছা

হত তারা বাপ-ঠাকুরদার চেয়ে দ্রুতগামী হয়ে উঠত। এমনি করে যেত এক পুরুষের পর আর-এক পুরুষ, তার পর আবার আর-এক পুরুষ এগিয়ে যেত, ততই দৌড়ের বেগও তাদের মধ্যে বেড়ে যেত। এই দ্রুতগামী জাতের নেকড়ে বা কুকুর একটা বিশেষ জাতের কুকুর হয়ে উঠল, তাদের নাম দেওয়া হল গ্রে হাউণ্ড্।

হাজার হাজার বৎসর ধ'রে মানুষ পৃথিবীতে তার স্বভাব ও কাজকর্ম বদলাতে বদলাতে এগিয়ে চলল। এখন আর তারা শুধু শিকার করে না, তারা চাষী হয়ে উঠল। তারা বেদেদের মতো আজ এখানে কাল সেখানে এমনি ক'রে আর ঘুরে বেড়ায় না। তাদের বাড়ি হয়েছে, বস্তি হয়েছে, গ্রাম হয়েছে। তাদের পরিবার বড়ো হয়ে চলেছে। বাইসন, মোষ, ভেড়া, ছাগল, মুরগি, হাঁস, শুয়োর, এ-সবই বন্য অবস্থা থেকে গৃহপালিত হতে শুরু করেছে। বাইসন, মোষ, এই-সব দুর্দান্ত জানোয়ারকে আগলানো ও সামলানো যায় কেমন করে। ভেবে ভেবে খুঁজে পাওয়া গেল আর-এক জাতের নেকড়ে। তাদের দেহ খুব শক্তিশালী, চোয়াল খুব জোরালো, স্বভাব নির্ভীক, আর তারা একবার যা করতে ইচ্ছা করে তা না করে ছাড়ে না। এ জাতের নেকড়েকে আলাদা করে নিয়ে, এক পুরুষের পর আর-এক পুরুষ, তার পর আবার আর-এক পুরুষ এমনি ক'রে ওদের বংশে ওদের পূর্বপুরুষদের গুণগুলি এমন বাড়িয়ে তোলা হল যে, অত্যন্ত দুর্দান্ত ষাঁড়গুলিও ওদের কাছে ঘায়েল; এই ষণ্ড-দমন কুকুরের নাম দেওয়া হল বুল ডগ। এরা যে এক সময় ষাঁড়দের কাবু করে ফেলবার কাজে নিযুক্ত হত তার একটা প্রমাণ হচ্ছে এই যে, এদের আক্রমণ করবার ধরন মাথার দিক দিয়ে নাকে ধ'রে টান মারা। সেই টানে অত্যন্ত দুঃশাসন ষাঁড় মোষ সবাই কাবু।
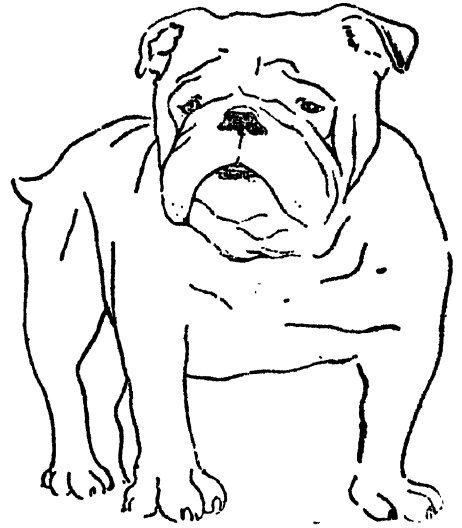
বুল ডগ

পয়েন্টার্স্ ব'লে একরকমের কুকুর আছে, শিকারীরা এদের সঙ্গে রাখেন। শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বার ঠিক পূর্বমুহূর্তে কুকুর দম ধ'রে থমকে দাঁড়ায় একটুখানি সময়। এই সময়টুকু নেয় শুধু একবার শিকারকে ভালো ক'রে দেখে নেবার জন্যে। এই দেখে-নেবার সময়টা যে-জাতীয় কুকুরের সব চেয়ে বেশি সেই-জাতীয় কুকুর বেছে নিয়ে মানুষ শুরু ক'রে দিল তার উন্নতির চেষ্টা। বাপ শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বার আগে যতটুকু সময় দাঁড়াত, তার বাচ্ছা তার চেয়ে একটু বেশি সময় নিতে লাগল। সেই বাচ্ছা বড়ো হলে তার যে বাচ্ছা হল সে আরো একটু বেশি সময় নিল। এমনি করে পুরুষের পর পুরুষ যেমন এগিয়ে চলল, শিকার দেখে নেবার সময়ও তেমনি ক্রমেই বেড়ে যেতে লাগল। এই সময় বাড়তে বাড়তে অনেক পুরুষ পরে এমন অবস্থা হল যে, ওরা শিকার দেখলে ওদের মুখের সামনের দিকটা, বিশেষ ক'রে নাকটা, শিকারের দিকে তুলে ধ'রে সামনের একটা পা মাটি থেকে একটু তুলে রেখে, আর লেজটাকে পিছনের দিকে সোজা ক'রে বাড়িয়ে দিয়ে, ভাবটা করে এমন যেন লাফিয়ে পড়বে এক্ষুনি। কিন্তু আশ্চর্যের কথা যে, জায়গা ছেড়ে সে একটুও এগোয় না। শিকারী ওর দৃষ্টি কোন্ দিকে তাই দেখে গুলি ছোঁড়েন। তা হলে মানুষ এই কুকুরকে নিজের কাজে লাগাবার জন্য, ওর স্বভাবের যে বৈশিষ্ট্যটুকু ছিল তার কতখানি উন্নতি করে নিল, তা বোঝা গেল। শিকার ধরবার আগে ওরা যে একটুক্ষণ দেরি করত সেই 'ক্ষণ'টুকু বাড়িয়ে বাড়িয়ে মানুষ এত লম্বা করে ফেলল যে, এখন ওরা নড়েই না, একেবারে স্থির হয়ে থাকে।
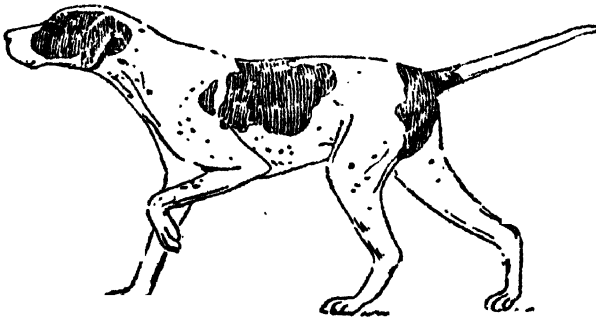
পয়েন্টার্স্

কুকুরদের কথা বলতে থাকলে সে কথা আর ফুরোয় না। একখানা মোটা বই লিখে ফেললেও খুব কমই বলা হয়।

অন্য মা

আমার মা না হয়ে তুমি আর কারো মা হলে
ভাবছ তোমায় চিনতেম না, যেতেম না ওই কোলে ?

মজা আরো হত ভারি,
দুই জায়গায় থাকত বাড়ি—
আমি থাকতেম এই গাঁয়েতে,
তুমি পারের গাঁয়ে।

এইখানেতেই দিনের বেলা
যা-কিছু সব হত খেলা,
দিন ফুরোলেই তোমার কাছে
পেরিয়ে যেতেম নায়ে।

হঠাৎ এসে পিছন দিকে
আমি বলতেম, "বল্ দেখি কে।"
তুমি ভাবতে, "চেনার মতো,
চিনি নে তো তবু।"

তখন কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে
আমি বলতেম গলা ধরে,
"আমায় তোমার চিনতে হবেই
আমি তোমার অবু।"

ওই পারেতে যখন তুমি আনতে যেতে জল,
এই পারেতে তখন ঘাটে বল্ দেখি কে বল্।

কাগজ-গড়া নৌকোটিকে
ভাসিয়ে দিতেম তোমার দিকে,
যদি গিয়ে পৌঁছত সে
বুঝতে কি সে কার।

সাঁতার আমি শিখি নি যে,
নইলে আমি যেতেম নিজে,
আমার পারের থেকে আমি
যেতেম তোমার পার।

মায়ের পারে অবুর পারে
থাকত তফাত, কেউ তো কারে
ধরতে গিয়ে পেত নাকো,
রইত না একসাথে।

দিনের বেলায় ঘুরে ঘুরে
দেখাদেখি দূরে দূরে—
সন্ধেবেলায় মিলে যেত
অবুতে আর মাতে।

কিন্তু হঠাৎ কোনো দিনে যদি বিপিন মাঝি
পার করতে তোমার পারে নাই হত মা রাজি ?

ঘরে তোমার প্রদীপ জ্বেলে
ছাতের 'পরে মাতুর মেলে
বসতে তুমি, পায়ের কাছে
বসত ক্ষান্ত বুড়ি—

উঠত তারা সাত ভায়েতে,
ডাকত শেয়াল ধানের খেতে,
উড়ো ছায়ার মতো বাতুড়
কোথায় যেত উড়ি।

তখন কি মা, দেরি দেখে
ভয় হত না থেকে থেকে,
পার হয়ে মা, আসতে হতই
অবু যেথায় আছে।

তখন কি আর ছাড়া পেতে।
দিতেম কি আর ফিরে যেতে।
ধরা পড়ত মায়ের ওপার
অবুর পারের কাছে।

চাঁদ ও চাঁদের কলঙ্ক

আকাশে সূর্যের পরেই আমাদের নজর পড়ে চাঁদের দিকে। সূর্যকে দেখি দিনের বেলায়। চাঁদকে দেখি রাত্রে। মাঝে মাঝে দিনেও চাঁদ দেখা যায়, কিন্তু সে খুব অস্পষ্ট। সূর্যের উজ্জ্বল আলোতে চাঁদকে দেখায় ম্লান। চাঁদের নিজের কোনো আলো নেই, সূর্যের আলোতেই তার আলো। আমাদের পৃথিবীরও নিজের আলো নেই, কিন্তু চাঁদে ব'সে যদি কেউ পৃথিবীর দিকে তাকায় তা হলে তাকেও দেখবে বেশ উজ্জ্বল। চাঁদ ও পৃথিবী দুইই আলো পায় সূর্য থেকে।

সূর্য পৃথিবী থেকে প্রায় তেরো লক্ষ গুণ বড়ো। প্রায় পঞ্চাশটা চাঁদকে একত্র করলে আয়তনে আমাদের পৃথিবীর সমান হবে। সূর্যের চেয়ে এত ছোটো হলেও খালি চোখে চাঁদকে কিন্তু দেখায় সূর্যেরই মতো বড়ো। কেন এমন হয়। সূর্য বড়ো বটে, কিন্তু দূরেও আমাদের থেকে অনেকটা, প্রায় ন কোটি মাইল। কিন্তু চাঁদের দূরত্ব পৃথিবী থেকে প্রায় দু লক্ষ মাইল। ন কোটির কাছে দু লক্ষ কিছুই নয়। দু লক্ষ মাইল দূরে হলেও সারা আকাশে যত জ্যোতিষ্ক আছে তাদের তুলনায় চাঁদই আমাদের সব চেয়ে কাছে। এতটা কাছে থাকার দরুনই চাঁদ সূর্য থেকে লক্ষ লক্ষ গুণ ছোটো হলেও, আকাশের গায়ে দুটিকেই দেখায় একই আকারের।

সূর্য ও চাঁদের দূরত্ব মাইল গুনে বললে কিছুই বলা হয় না। কারণ কোটি মাইল বলতে যে কতটা দূর তা আমাদের ধারণাই হয় না। এদের দূরত্বের কতকটা ধারণা হতে পারে একটা উদাহরণ দিলে। মনে করা যাক, পৃথিবী থেকে চাঁদ ও সূর্য পর্যন্ত রেল-লাইন পাতা হল। ঘণ্টায় ষাট মাইল বেগে চলে এমন একটি রেলগাড়িতে চ'ড়ে চাঁদে রওনা হলাম। সেখানে পৌঁছতে লাগবে প্রায় পাঁচ মাস। সূর্যে যেতে প্রায় একশো পঁচাত্তর বছর; আমাদের এক জীবনেও সূর্যে পৌঁছনো যাবে না। এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে, সূর্যের তুলনায় চাঁদ আমাদের কত কাছে।

কলকাতার 'ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল'এর মতো কোনো বড়ো বাড়ি যদি চাঁদে থাকত তা হলে আজকালকার বড়ো দূরবীনে তা দেখা যেত। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো

বাড়ির চিহ্ন চাঁদে দেখা যায় নি। চাঁদে মানুষই নেই, বাড়িঘর তৈরি করবে কে। শুধু মানুষ নয়, কোনো জীবজন্তুও সেখানে নেই। বেঁচে থাকার জন্যে যে জল ও হাওয়া নিতান্ত আবশ্যক, চাঁদে তা নেই।

যদিও চাঁদ পৃথিবী থেকে এতটা দূরে, তবু তা কত বড়ো, দেখতে কেমন, ওজনে কত ভারী, তাও জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের হিসাব থেকে জানা গেছে। এই হিসাব থেকে জানতে পাই, আয়তনের তুলনায় চাঁদ অপেক্ষাকৃত হালকা। পৃথিবী আয়তনে পঞ্চাশটা চাঁদের সমান, কিন্তু ওজনে প্রায় বিরাশিটা চাঁদের মতো। এতেই বোঝা যাচ্ছে, চাঁদ যে মাটি-পাথর দিয়ে তৈরি তা পৃথিবীর মাটি-পাথরের মতো ভারী নয়।

জিনিস মাত্রই পরস্পরকে কাছে টানে। তাই পৃথিবী সব জিনিসকে টানছে আপন কেন্দ্রের দিকে। এইজন্যেই জিনিস উপর থেকে নীচে পড়ে, আর তার ওজন বলতে এই টানটাকেই বোঝায়। যে জিনিসে বস্তুর পরিমাণ বেশি তার টানের জোরও বেশি। চাঁদ হালকা ব'লে তার টানটাও হবে কম। হিসেব ক'রে জানা গেছে, চাঁদের টান পৃথিবীর টানের ছ ভাগের এক ভাগ। পৃথিবীতে যে জিনিস ওজনে ছ মোন ভারী, চাঁদে তারই ওজন হবে মাত্র এক মোন। পৃথিবীতে যে লোক এক মোন জিনিস ঘাড়ে বইতে পারে, চাঁদে গেলে সে পারবে ছ মোন। পৃথিবীতে যে ছেলে একটা ঢিল ছুঁড়ে দশ গজ দূরে ফেলতে পারবে, সে ছেলে সেই ঢিলই চাঁদে ছুঁড়বে ষাট গজ দূরে। ক্রীড়া-প্রতিযোগিতায় যে ছেলে এখানে লাফাতে পারবে চব্বিশ ফুট, চাঁদে সে লাফাবে একশো চুয়াল্লিশ ফুট।

রাত্রিতে খালি চোখে তাকালেও চাঁদের অনেকটা জায়গা জুড়ে কালো কালো দাগ দেখতে পাওয়া যায়। এই কালো দাগকে চাঁদের কলঙ্ক বলা হয়। এ-সব কালো দাগ নিয়ে অনেক আজগুবি গল্প চলতি আছে। কেউ কেউ এই কালো দাগের মধ্যে দেখেছে চরকাবুড়িকে বসে সুতো কাটতে, কেউ দেখেছে এর মধ্যে দৈত্যদানবের মূর্তি, কেউ কেউ চাঁদকে আবার একটা বড়ো আয়না ব'লে ভেবেছে, আর তার কালো দাগগুলিকে মনে করেছে যেন পৃথিবীর পাহাড়-পর্বতের প্রতিচ্ছবি।

এ-সবই যে মানুষের নিছক কল্পনা তা প্রথম জানা গেল বিখ্যাত বিজ্ঞানী

গ্যালিলিও'র দূরবীনে। প্রথম দূরবীন তৈরি ক'রে তিনিই সবার আগে চাঁদকে দূরবীন দিয়ে দেখেন। তিনি যা দেখতে পেলেন তার কাছে মানুষের কল্পনাও হার মানে। এই কালো দাগ চরকাবুড়িও নয়, দৈত্যদানবের মূর্তিও নয়, আর পৃথিবীর প্রতিচ্ছবিও নয়; এগুলি হচ্ছে চাঁদের বড়ো বড়ো গুহাগহ্বর, পাহাড়-পর্বত। দূরবীন অতি আশ্চর্য যন্ত্র। সাধারণ দুখানা আতস কাঁচ পর পর সাজিয়ে দূরবীন তৈরি করা যায়। এর ভিতর দিয়ে দূরের জিনিসকে কাছে ও বড়ো দেখায়। এখন এতবড়ো দূরবীন তৈরি হয়েছে যে, পৃথিবী থেকে দুশো চুয়াল্লিশ মাইল দূরে থাকলে চাঁদকে যত বড়ো দেখাত এই দূরবীনের ভিতর দিয়ে তাকে তত বড়ো দেখায়। দুশো চুয়াল্লিশ মাইল খুব বেশি দূর নয়, তার উপর চাঁদও নিতান্ত ছোটো নয়। কাজেই বড়ো দূরবীনে চাঁদকে খুবই স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। এখন চাঁদের এমন-সব ম্যাপ তৈরি হয়েছে যে, তার উপরে কোথায় কী আছে তা সবই জানা যায়। কোথায় কোন্ পাহাড়, সে পাহাড় কত উঁচু, কোথায় কোন্ গহ্বর, তা কতদূর বিস্তৃত, কত গভীর, কোথায় কোন্ সমতল ভূমি, কোথায় কোন্ ফাটল— এই-সবই এখন চাঁদের ম্যাপ দেখে জানতে পারা যায়। বিজ্ঞানীরা দূরবীন দিয়ে চাঁদকে তন্ন তন্ন ক'রে দেখেছেন, ফোটোগ্রাফি যন্ত্রে এর অসংখ্য ছবিও তুলেছেন।

দূরবীনে চাঁদকে দেখলে সারা চাঁদ জুড়ে পাহাড়-পর্বতই দেখা যায়। দার্জিলিঙ সিমলা প্রভৃতি পাহাড়ে উঠে চার দিকে তাকালে যেমন সামনে পিছনে ডাইনে বাঁয়ে কেবলই পাহাড়ের পর পাহাড় দেখতে পাই, গোটা চাঁদটাও দেখতে প্রায় তেমনি। চাঁদের পাহাড়গুলি উঁচুও নিতান্ত কম নয়। পৃথিবীর সব চেয়ে উঁচু পর্বত হিমালয়, তার উচ্চতা প্রায় পাঁচ মাইল। চাঁদে পাঁচ মাইল উঁচু না থাকলেও চার মাইল উঁচু পাহাড় অনেক আছে। সেই উঁচু পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে সামনে তাকালে দেখা যাবে বহুদূর-বিস্তৃত সমতল প্রান্তর। সেই প্রান্তর থেকে পাহাড়ের ধার একেবারে দেয়ালের মতো খাড়া উঠেছে। এমন খাড়া পাহাড় পৃথিবীতে দেখা যায় না।

চাঁদের বেশির ভাগ পাহাড়ই আগ্নেয় পাহাড়। এক কালে এর ভিতরকার আগুনের ঠেলায় এই-সব পাহাড়ের জন্ম হয়। পৃথিবীতেও এইরকম অনেক আগ্নেয়

পাহাড় দেখতে পাওয়া যায়। ইটালীর ভিস্যুভিয়স তাদের মধ্যে একটি। এখনো এর মুখ দিয়ে মাঝে মাঝে আগুন বের হয়। জাপানের ফুজিয়ামা পাহাড়ও এমনি একটি আগ্নেয়গিরি। কিন্তু চাঁদের এই পাহাড়গুলির ভিতর এখন আর আগুন নেই, অনেক কাল হল নিবে গেছে।

দূরবীনের ভিতর দিয়ে বড়ো বড়ো গহ্বরের মতো এদের মুখগুলি এখনো স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। এ-সব মুখের বিস্তৃতিও কম নয়। আট-দশ মাইল থেকে আরম্ভ করে একশো দেড়শো মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত মুখও সেখানে আছে। চাঁদের গহ্বরে ও আগ্নেয়গিরির বিস্তৃত মুখে যে ছায়া পড়ে সেগুলিই এখান থেকে কালো দাগের মতো দেখায়। সব চেয়ে বেশি কালো দেখায় গহ্বরগুলিকে। চাঁদে বড়ো বড়ো গহ্বর আছে কিন্তু তাতে এক ফোঁটাও জল নেই। পৃথিবীর যেখানে যত সমুদ্র আছে আজ যদি সব শুকিয়ে যায় তা হলে দূর থেকে তাদের কেমন দেখাবে। গোটা পৃথিবীটাই হাঁ করে আছে বলে মনে হবে না? চাঁদের গহ্বরগুলিও তেমনি যেন হাঁ করে আছে। আর তার ধারে ধারে খাড়া দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়গুলি— বিরাট বিশাল এক-একটা কেল্লার দেয়ালের মতো। এদের ছায়া প'ড়ে গহ্বরগুলি আরো অন্ধকার হয়ে থাকে, এই অন্ধকার গর্তগুলিকেই চাঁদের গায়ে বেশি কালো দেখায়।

বুড়ি

এক যে ছিল চাঁদের কোণায় চরকা-কাটা বুড়ি,
পুরাণে তার বয়স লেখে সাতশো হাজার কুড়ি।
সাদা সুতোয় জাল বোনে সে, হয় না বুনোন সারা—
পণ ছিল তার, ধরবে জালে লক্ষ কোটি তারা।
হেন কালে কখন আঁখি পড়ল ঘুমে ঢুলে,
স্বপনে তার বয়সখানা বেবাক গেল ভুলে।
ঘুমের পথে পথ হারিয়ে মায়ের কোলে এসে
পূর্ণ চাঁদের হাসিখানি ছড়িয়ে দিল হেসে।
সন্ধেবেলায় আকাশ চেয়ে কী পড়ে তার মনে।
চাঁদকে করে ডাকাডাকি, চাঁদ হাসে আর শোনে।
যে পথ দিয়ে এসেছিল স্বপন-সাগর-তীরে
দু হাত তুলে সে পথ দিয়ে চায় সে যেতে ফিরে।
হেন কালে মায়ের মুখে যেমনি আঁখি তোলে
চাঁদে ফেরার পথখানি যে তক্‌খনি সে ভোলে।
কেউ জানে না কোথায় বাসা, এল কী পথ বেয়ে,
কেউ জানে না এই মেয়ে সেই আদ্যিকালের মেয়ে।
বয়সখানার খ্যাতি তবু রইল জগৎ জুড়ি—
পাড়ার লোকে যে দেখে সেই ডাকে 'বুড়ি' 'বুড়ি'।
সব চেয়ে যে পুরানো সে কোন্ মন্ত্রের বলে
সব চেয়ে আজ নতুন হয়ে নামল ধরাতলে।

সোহরাব রুস্তম ॥ ১ ॥

অনেক দিন আগেকার কথা। ইরানে ও তুরানে ঝগড়া-বিবাদ লেগেই থাকত। মাঝে মাঝে লড়াইও হত দুই দেশের মধ্যে। কিন্তু ইরানের সঙ্গে পেরে ওঠা শক্ত। ইরানদেশের রুস্তম ছিলেন সেকালের সেরা বীর। তাঁর হাতে তুরানীরা বার বার হার মানত।

একবার এরকম একটা যুদ্ধের পর রুস্তম গেলেন শিকারে, সঙ্গে তাঁর ঘোড়া রাকশ। ঘুরতে ঘুরতে এলেন তিনি তুরানের কাছাকাছি একটা জঙ্গলে। সন্ধ্যা হয়-হয়, বুনো গাধার পিছন পিছন ছুটে রুস্তম ও রাকশ দুজনেই হয়রান হয়ে পড়েছেন। মস্ত একটা গাছের তলায় রুস্তম শুয়ে পড়লেন, আর শোওয়া মাত্র ঘুম এল। রাকশ ছাড়া পেয়ে এখানে-ওখানে ঘাস খেয়ে বেড়াতে লাগল। এ দিকে এক কাণ্ড হয়ে গেল। রাত্রি যখন নিশুতি, রাকশ আপন মনে চরে বেড়াচ্ছে, এমন সময় সেই বনের পথে যাচ্ছিল কয়েকজন তুরানী। ঘোড়া চুরিই তাদের ব্যাবসা। অমন একটা তেজী ঘোড়া একলা চরছে দেখে তো ওরা খুব খুশি। কষ্টেসৃষ্টে ধরে বেঁধে রাকশকে ওরা তুরানে নিয়ে গেল।

ভোরবেলায় পাখিরা যখন সবে ডাকতে শুরু করেছে, রুস্তমের ঘুম গেল ভেঙে। অভ্যাসমত তিনি প্রথমেই রাকশের নাম ধরে ডাকলেন, কিন্তু কোনো সাড়াশব্দ পেলেন না। এমন তো কখনো হয় না। তিনি ব্যস্ত হয়ে এ পথে ও পথে খুঁজে বেড়ালেন, কোথাও তার দেখা পেলেন না। শেষে বনের বাইরে রাকশের বড়ো বড়ো খুরের দাগ দেখে বুঝলেন, তুরানীরা তাকে চুরি করে নিয়ে গেছে।

রেগে লাল হয়ে সেই পায়ের দাগ ধ'রে ধ'রে রুস্তম সামেনগান শহরে উপস্থিত। তাঁর বলিষ্ঠ চেহারা ও মাথায় সোনার শিরস্ত্রাণ দেখে তুরানীদের বুঝতে দেরি হল না যে, এ আর কেউ নয়, ইরানের মহাবীর স্বয়ং। কেউ গেল ভয়ে পালিয়ে, কেউ-বা তাড়াতাড়ি ছুটল শহরের সামন্তরাজকে খবর দিতে। শত্রু হলেও অতিথিকে সম্মান করা তখনকার দিনের রীতি ছিল। তাই রাজা গিয়ে সমাদর দেখিয়ে রুস্তমকে নিয়ে এলেন তাঁর প্রাসাদে। চুরির খবর পেয়ে তিনি তখনই চারি দিকে সেপাইশাস্ত্রীদের পাঠালেন

রাকশের খোঁজ করতে। ঘটা করে মস্ত ভোজের আয়োজন হল।

খেয়ে-দেয়ে রুস্তম হাতির-দাঁতের-কাজ-করা পালঙ্কে নরম গদির উপর গা এলিয়ে শুয়ে আছেন। তন্দ্রার ভাব এসেছে, এমন সময় তিনি যেন স্বপ্নে দেখলেন, তাঁর শিয়রের কাছে দাঁড়িয়ে পরমাসুন্দরী এক মেয়ে। চমকে জেগে উঠে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "কে তুমি।" ধীর গলায় জবাব এল, "আমি সামেনগানের সামন্তরাজের মেয়ে তাহমিনে। আপনার বীরত্বের কথা শুনে অনেক দিন আগেই মনে মনে আপনাকে স্বামী ব'লে বরণ করেছি। আর হয়তো সুযোগ হবে না, তাই সেই কথাটি জানিয়ে গেলাম।" এই ব'লে তাহমিনে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলেন। কেবল তাঁর মিষ্টি কথাগুলো যেন বাতাসে ভেসে বেড়াতে লাগল। সারা রাত রুস্তম ভাবতে লাগলেন তাহমিনের কথা। তার পরদিন সকালবেলা সামন্তরাজের কাছে দরবার জানিয়ে বললেন যে, তাহমিনেকে তিনি বিয়ে করতে চান। অমন মহাবীরকে জামাইভাবে পেতে কার না ইচ্ছা হয়, তাহমিনের বাবা তখনই রাজি হলেন।

খুব জাঁক করে শুভদিনে দুজনার বিয়ে হল। রুস্তম ও তাহমিনে মনের সুখে থাকতে লাগলেন। কিন্তু বীরের মন চায় নিত্য নূতন বিপদ-আপদের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়তে, তাঁর সেই একঘেয়ে আরামের জীবন ভালো লাগবে কেন। রাকশকে ফিরে পাবার পর থেকেই রুস্তমের মন ইরানে যাবার জন্য আকুল হয়ে উঠল।

বিদায়ের দিন এল। রুস্তম তাহমিনেকে ডেকে তাঁর হাতে নিজের নাম লেখা একটা তাবিজ দিয়ে বললেন, "দেশে ফিরছি, হয়তো শীঘ্র তোমার সঙ্গে দেখা হবে না। তাবিজটা দিয়ে গেলাম; আমাদের যদি ছেলে হয় তার হাতে এটা পরিয়ে দিয়ো, আর মেয়ে হয় তো চুলে গুঁজে দিয়ো।" এই ব'লে রাকশের পিঠে চ'ড়ে রুস্তম রওনা হলেন। জাফরি-কাটা জানালার ভিতর দিয়ে তাহমিনে একদৃষ্টে পথের দিকে চেয়ে রইলেন। আর যখন সোনার শিরস্ত্রাণটি দেখা গেল না তখন তাঁর চোখে জল এল, তিনি সেই হাতির-দাঁতের-কাজ-করা পালঙ্কে আছড়ে প'ড়ে কেঁদে উঠলেন। ভগবানকে প্রার্থনা জানিয়ে বললেন, "আমায় এমন একটি ছেলে দাও যাকে পেয়ে আমি রুস্তমকে হারানোর দুঃখ ভুলতে পারি।"

তাহমিনের প্রার্থনা পূর্ণ হল; যথাসময়ে তাঁর একটি কোল-আলো-করা সুন্দর ছেলে হল। সামেনগানের সামন্তরাজা নাতির নাম দিলেন সোহরাব। পাছে খবর পেয়ে রুস্তম ছেলেকে নিজের কাছে নিয়ে যান সেই ভয়ে দূত পাঠিয়ে তাহমিনে সংবাদ পাঠালেন যে, তাঁর একটি মেয়ে হয়েছে। তখনকার দিনে লোকে মেয়ে হওয়াকে মনে করত দুর্ভাগ্য; তাই সেই অবধি রুস্তম সামেনগানের কথা, তাহমিনের কথা যেন জোর করেই মন থেকে মুছে ফেললেন।

দিন যায়। সোহরাবও দেখতে দেখতে বেড়ে উঠছে। একদিন সে তার মাকে এসে বললে, "সব ছেলের বাবা আছে, আমার বাবা নেই কেন, মা।" মা তাকে কোলে টেনে নিয়ে চুমো খেয়ে বললেন, "কে বলে তোমার বাবা নেই, সোহরাব। তোমার বাবা হলেন ইরানের দিগ্‌বিজয়ী বীর রুস্তম। এই দেখো, তোমার হাতে তাঁর নাম-লেখা তাবিজ রয়েছে।" মার কাছে বাবার বীরত্বের গল্প শুনে সোহরাব ধরে বসল, সে তার বাবার কাছে যাবে। তাহমিনে তখন অনেক ক'রে তাকে বুঝিয়ে বললেন যে সোহরাব তাঁকে ছেড়ে গেলে তাঁর বুক ভেঙে যাবে। বললেন, "তুমি ছাড়া আমার তো কেউ নেই, বাবা।"

যত তার বয়স হতে লাগল, ততই সোহরাব অস্ত্রবিদ্যায় পটু হয়ে উঠতে লাগল। তলোয়ার-খেলায় ও বর্শা-ছোঁড়ায় যখন সে তার ওস্তাদদেরও হার মানাল তখন লোকে বললে, "হাঁ 'বাপকা বেটা' বটে।"

গান

আমাদের ভয় কাহারে।
বুড়ো বুড়ো চোর-ডাকাতে
কী আমাদের করতে পারে।
আমাদের রাস্তা সোজা, নাইকো গলি,
নাইকো ঝুলি, নাইকো থলি—
ওরা আর যা কাড়ে কাড়ুক, মোদের
পাগ্‌লামি কেউ কাড়বে না রে।
আমরা চাই নে আরাম, চাই নে বিরাম,
চাই নে যে ফল, চাই নে রে নাম,
মোরা ওঠায় পড়ায় সমান নাচি,
সমান খেলি জিতে হারে—
আমাদের ভয় কাহারে॥

মাকড়সা

পৃথিবীতে যত রকমের প্রাণী আছে তাদের মোটামুটি দু ভাগে ভাগ করা চলে— মেরুদণ্ডী এবং অমেরুদণ্ডী, অর্থাৎ যাদের মেরুদণ্ড বা পিঠের শিরদাঁড়া আছে এবং যাদের তা নেই। মাকড়সা অমেরুদণ্ডী। বিজ্ঞানীদের মতে এরা কাঁকড়া-বিছার নিকট-আত্মীয়।

মাকড়সার শরীরের গড়ন একটু অদ্ভুত। এদের শরীর, মাথা বুক পেট এই তিন ভাগে ভাগ করা নেই। বুক আর মাথা জুড়ে গিয়ে এক হয়ে গেছে। বুকের তলায় দু সারিতে থাকে চার জোড়া পা। কারো পা হয় খুব লম্বা লম্বা, কারো হয় ছোটো। এক-একটি পা আবার সাতটি ছোটো ছোটো টুকরো দিয়ে তৈরি। পায়ে অনেকগুলি ক'রে ধারালো নখ থাকে। তাই এরা এত সহজে দেয়ালে ও ছাদে ছুটোছুটি করে বেড়াতে পারে। মাথার উপরে দু সারে সাজানো থাকে আটটি গোল গোল চোখ। মুখের ঠিক দু পাশে ছোটো পায়ের মতো উপাঙ্গ থাকে এক জোড়া, এদের বলা চলে মাকড়সার দাঁত। এই দাঁত দেখতে ঠিক আধখোলা কলম-কাটা ছুরির মতো। এদের গোড়ায় থাকে বিষের থলি। মাকড়সা তার শিকারের গায়ে এই দাঁত ফুটিয়ে থলি থেকে বিষ ঢেলে দেয়। দাঁতের গায়ের ছেঁদা দিয়ে বিষ বেরিয়ে শিকারের শরীরে প্রবেশ করে। তার ফলে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই সে মারা পড়ে। তখন মাকড়সা তার দেহের রস চুষে খায়।
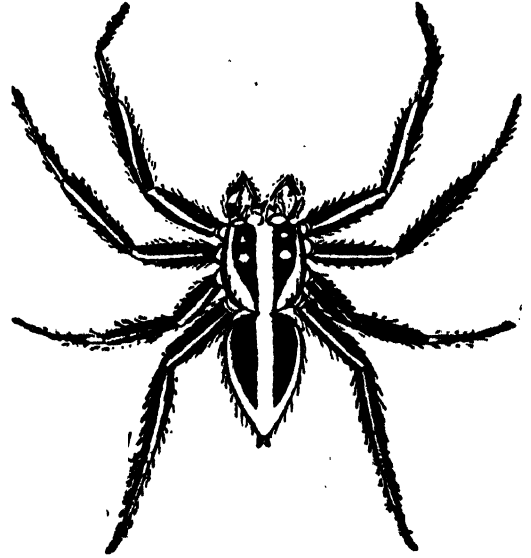
মাকড়সার দেহের আবরণ, ছোটো ছোটো শুঁয়োয় ঢাকা একটা মরা চামড়া—অর্থাৎ সেটা একটা খোলস মাত্র, এবং রক্তের সঙ্গে তার কোনো যোগ নেই বললেই চলে। তাই দেহ যখন বাড়ে আবরণটা সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে না। তখন তার বড়ো শরীর চামড়ার ছোটো খোলসটিতে আর ধরে না বলেই সেটাকে ফাটিয়ে বাইরে চলে আসে। একেই বলে খোলস বদলানো।

পুরুষ-মাকড়সা স্ত্রী-মাকড়সার চেয়ে দেখতে অনেক বেশি সুন্দর এবং রঙ্‌চঙে। কিন্তু আয়তনে স্ত্রী-মাকড়সা পুরুষ-মাকড়সা থেকে প্রায় দশ-বারো গুণ বড়ো হয়। স্ত্রী-মাকড়সার রাগ অত্যন্ত বেশি এবং রেগে গেলে সঙ্গী পুরুষটিকে মেরে ফেলে তার রস চুষে খেয়ে ফেলে। স্ত্রী-মাকড়সা ডিম পাড়ে একসঙ্গে অনেকগুলি ক'রে। ডিমগুলি একটা রেশমের থলিতে ক'রে কোনো জায়গায় লুকিয়ে রাখে অথবা জালের মাঝখানে ঝুলিয়ে দেয়। কোনো কোনো অতিসাবধানী মা ডিমের থলিটাকে বুকে নিয়েই ঘুরে বেড়ায়। ডিম ফুটে যে বাচ্ছা বেরোয়, তারা ছোটো হলেও পূর্ণাঙ্গ মাকড়সা। এরা বার-কয়েক খোলস বদলে বড়ো হয়। মা-মাকড়সা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বাচ্ছাদের দিকে মোটে ফিরেই তাকায় না। দু-এক ক্ষেত্রে অবশ্য মাকে দেখা গেছে বাচ্ছাদের খাবার এনে খাইয়ে দিতে।

মাকড়সার আর-এক নাম ঊর্ণনাভ, অর্থাৎ এদের নাভিতে নাকি সুতো থাকে। মাকড়সার নাভি নেই, তবে এদের পেটের তলাতেই জাল বোনার যন্ত্র থাকে, সংখ্যায় চারটি থেকে ছ'টি। এই যন্ত্র থেকে এরা একরকম রস বার করে। সে রস বাতাসে শুকিয়ে খুব মিহি সুতোয় পরিণত হয়। এই সুতো দিয়েই এরা জাল বোনে। দেখা গেছে, জাল বোনার কাজে স্ত্রী-মাকড়সা পুরুষ-মাকড়সার চেয়ে অনেক বেশি ওস্তাদ।

কীটপতঙ্গের রসই হল মাকড়সার খাদ্য, পোকা ধরবার জন্যই এরা জাল বুনে ফাঁদ পাতে। ভারি সুন্দর এদের এই জাল বোনার কৌশলটি। বাগানের মাকড়সা প্রথমে একটা ডাল ঠিক ক'রে নিয়ে তার উপরে গিয়ে বসে। তার পর যে দিকে হাওয়া বইতে থাকে সে দিকে তার সুতো তৈরি ক'রে ছাড়তে থাকে। সুতোটি হাওয়ায় উড়ে গিয়ে কোথাও লেগে যায়। তার পর মাকড়সা সেই সুতো ধরে সেখানে গিয়ে হাজির

হয় আরো নতুন সুতো ছাড়তে ছাড়তে। আবার সেই পথ ধরেই আধাআধি আন্দাজ ফিরে এসে সুতো ছাড়তে ছাড়তে ঝুলে সোজা নীচে নেমে যায়। সেখানে কোথাও সুতোটা আটকে রেখে সেটা ধরেই সোজা উপরে উঠে আসে। এমনি করে এক জায়গা থেকে আর-এক জায়গায়, এক সুতো থেকে অন্য সুতোয় ক্রমাগত ছুটোছুটি ক'রে কিছুক্ষণের মধ্যেই সুন্দর একটি জাল বুনে ফেলে। এদের জালের বিশেষ একটা নকশা থাকে, ভিন্ন ভিন্ন জাতের মাকড়সা ভিন্ন ভিন্ন নকশার জাল বোনে। জাল বোনা হয়ে গেলে সেই জাল থেকে একটি সুতো পায়ের সঙ্গে আটকে নিয়ে মাকড়সা কাছেই কোথাও লুকিয়ে থাকে। জালে শিকার পড়লেই সেই সুতোয় পড়ে টান, আর তক্‌খুনি সে ছুটে এসে তার দাঁতের মতো অস্ত্রদুটি দিয়ে শিকারের গায়ে বিষের ইনজেকশন্‌ দিয়ে তাকে মেরে ফেলে।
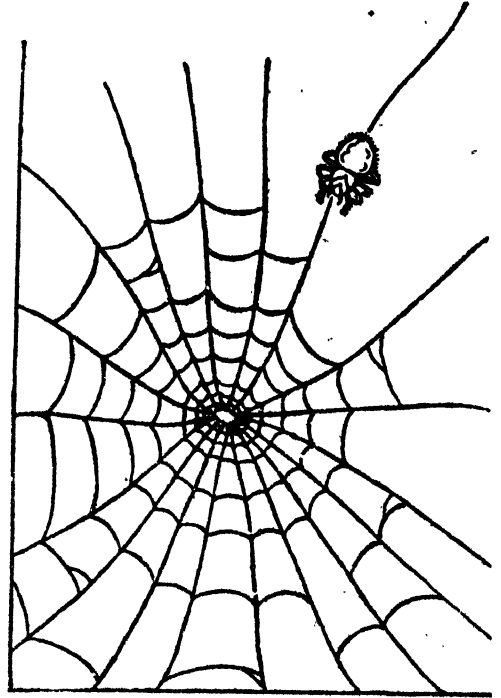
বাগানের মাকড়সার জাল দেখতে ভারি সুন্দর হয়। তার উপরে সকালের শিশির পড়লে সৌন্দর্য বেড়ে যায় আরো অনেক গুণ। কিন্তু ঘরের কোণে লম্বা-পা-ওয়ালা মাকড়সা যে জাল বোনে তার বিশেষ কোনো একটা নকশা নেই বললেই চলে। এদিক-ওদিক কতকগুলো সুতো টেনে হিজিবিজি গোছের একটা জাল বুনে পোকার অপেক্ষায় সে বসে থাকে।

ম্যাডাগাস্কার দ্বীপে এক জাতের খুব বড়ো মাকড়সা দেখা যায়। এদের জাল

যেমন বড়ো তেমনি ঘন। এরা জাল দিয়ে মাঝে মাঝে এক-একটা মাঝারি গোছের গাছ একেবারে ঢেকে ফেলে। আর-একরকম মাকড়সা আছে লঙ্কাদ্বীপে। তারা তাদের জালে ইঁদুর পর্যন্ত ধরে খায়। এদের জালের সুতো যেমন মজবুত তেমনি ধারালো। হাতে লাগলে হাত কেটে যায়।

এক জাতের মাকড়সা আছে তারা ঠিক জাল বোনে না। গাছ থেকে শুধু লম্বা লম্বা সুতো তৈরি ক'রে নীচে ঝুলে থাকে। এই সুতোয় যে-সব পোকা ধরা পড়ে, এরা তাদেরই খায়। এমনি ক'রে হালকা সুতোয় ঝুলে এক জাতের ছোটো মাকড়সা হাওয়ায় ভেসে উড়ে চলে যায়। এই লম্বা সুতোগুলিই প্যারাস্যুটের মতো এদের হাওয়ায় ভাসিয়ে রাখে। হাওয়ায় ভেসে এরা অনেক দূর চলে যেতে পারে। যখন কোথাও নেমে পড়ে তখন তাদের সুতোগুলি ছিঁড়ে গিয়ে উড়ে এদিকে-ওদিকে এবং প্রায়ই আমাদের নাকে মুখে চোখে এসে লাগে।

এমন কয়েক জাতের মাকড়সা আছে, যারা শিকারের আশায় ফাঁদ পাতে না। আড়াল থেকে একেবারে শিকারের উপর লাফিয়ে পড়ে বড়ো বড়ো হিংস্র জন্তুদের মতোই। আমেরিকায় মাইগেল ব'লে একরকম মাকড়সা আছে, তারা ঠিক এরকম করেই ছোটো ছোটো পাখি পর্যন্ত মেরে খায়।

বেশির ভাগ মাকড়সাই স্থলচর। কিন্তু জলচর মাকড়সাও আছে। তারা থাকে পুকুর খাল বিল ইত্যাদির জলে। এদের শরীরের শুঁয়োগুলি খুব বেশি ঘন থাকে ব'লে কখনো ভেজে না। জলের ভিতরে একরকম রেশমের বাসা তৈরি ক'রে এরা থাকে। জলের মাছ, জলের পোকা ও গুগ্‌লিই এদের খাদ্য।

এক জাতের মাকড়সা আছে, তারা যদিও ডাঙায় থাকে তবুও জলে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে ছোটো ছোটো মাছ শিকার করে আনে।

সাধারণত প্রায় সব মাকড়সাই ঘুরে বেড়ায় দিনের বেলায়। কিন্তু রাত্রিতে বেরোয় এমন মাকড়সাও আছে। মাটিতে গর্ত খুঁড়ে এরা বাস করে। গর্তের ভিতরে দেয়ালে এরা লাগিয়ে রাখে মিহি জালের আস্তর। গর্তের মুখে থাকে কাদা আর জাল দিয়ে তৈরি ছোট্ট একটি গোল ঢাকনি। ঢাকনির এক পাশে গর্তের ধারে

লাগিয়ে রাখে এক টুকরো জাল দিয়ে। তাই হয় ঢাকনির কব্জা। এই ছোট্ট দোরটুকু তুলে ধ'রে মাকড়সা যাওয়া-আসা করে। দোরের ভিতর দিকে ছোটো ছোটো খাঁজ কাটা থাকে। বাইরে থেকে শত্রু ঢুকতে গেলে ভিতর থেকে এই খাঁজটা ধরেই মাকড়সা দোরটিকে টেনে রাখে।

মাকড়সা যেমন অনেক কীটপতঙ্গের শত্রু, তেমনি মাকড়সারও শত্রু আছে অনেক। পাখি, বোলতা, গিরগিটি, ব্যাঙ এবং আরো অনেক প্রাণীই মাকড়সা খায়। তাই এদের হাত থেকে বাঁচবার জন্য মাকড়সা নানা উপায় অবলম্বন করে। শত্রুকে কাছে দেখলেই কতক মাকড়সা গা ঢাকা দেয় কোনো-কিছুর আড়ালে। কতক আবার চট্ ক'রে ছুটে গিয়ে লুকোয় কোনো গর্তে বা ফাটলে। অনেক মাকড়সা রক্ষা পায় শুধু তাদের গায়ের রঙের জন্যেই। যে-সব মাকড়সা গাছে গাছে ঘুরে বেড়ায় তাদের গায়ের রঙ হয় গাছের ছালের মতো। যে ফুলে থাকে তার রঙ সেই ফুলের পাপড়িরই মতো। যে পাতায় পাতায় ঘুরে বেড়ায় তার রঙ হয় সবুজ। এমনি করেই তারা শত্রুর চোখকে ফাঁকি দিতে পারে।

আত্মরক্ষার সব চেয়ে অদ্ভুত উপায় দেখা যায় এক জাতের মাকড়সায়। শত্রু কাছে এসে পড়লে এরা একটা পা বাড়িয়ে দেয় তার দিকে। শত্রু যখন সেই পা নিয়ে ব্যস্ত থাকে সেই ফাঁকে মাকড়সা তার পা'টাকে ভেঙে ফেলে দৌড়ে পালায়। অবশ্য কিছু দিন পরেই সে জায়গায় আর-একটা নতুন পা গজিয়ে ওঠে।

গান

খরবায়ু বয় বেগে, চারি দিক ছায় মেঘে,
ওগো নেয়ে, নাওখানি বাইয়ো।
তুমি ক'ষে ধরো হাল, আমি তুলে বাঁধি পাল—
হাঁই মারো, মারো টান হাঁইয়ো॥
শৃঙ্খলে বার বার ঝন্‌ঝন্‌-ঝংকার
নয় এ তো তরণীর ক্রন্দন শঙ্কার,
বন্ধন দুর্বার সহ্য না হয় আর,
টলোমলো করে আজ তাই ও—
হাঁই মারো, মারো টান হাঁইয়ো॥

গনি গনি দিন খন চঞ্চল করি মন
বোলো না 'যাই কি নাই যাই রে'।
সংশয়-পারাবার অন্তরে হবে পার,
উদ্‌বেগে তাকায়ো না বাইরে।
যদি মাতে মহাকাল, উদ্দাম জটাজাল
ঝড়ে হয় লুণ্ঠিত, ঢেউ উঠে উত্তাল,
হোয়ো নাকো কুণ্ঠিত, তালে তার দিয়ো তাল,
'জয় জয়' জয়গান গাইয়ো—
হাঁই মারো, মারো টান হাঁইয়ো॥

সোহরাব রুস্তম ॥ ২ ॥

ইরানে তুরানে আবার বিবাদ বেধেছে। সোহরাব দেখলে রুস্তমের দেখা পাবার এই মস্ত সুযোগ। এইজন্যই যখন তুরানের বাদশা সোহরাবকে সেনাপতির পদ নিতে ডাকলেন তখন সে আর দ্বিধা করল না। সোহরাব বেরোল ইরান জয় করতে। তাহমিনের কোনো মিনতি তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারল না। যাবার সময় সে তার মাকে ব'লে গেল, "ভেবো না, মা, আমি যাচ্ছি বাবাকে ইরান তুরান দুই দেশের রাজমুকুট পরিয়ে দিতে।" অনেক দিন আগে রুস্তম যে পথ দিয়ে চলে গিয়েছিলেন, আজ ঠিক সেই পথে ঘোড়া ছুটিয়ে সোহরাব চলল; হাতে তার বর্শা, কোমরে তলোয়ার, গায়ে বর্ম আর মাথায় সোনার শিরস্ত্রাণ। জালিকাটা জানালার ধারে দাঁড়িয়ে তাহমিনে চেয়ে রইলেন। তাঁর চোখ জলে ভরে এল।

তুরানীরা যখন ইরানদেশের দরজায় হানা দিয়েছে তখন রুস্তম জাবুলিস্তানে। ইরানের বাদশা তাড়াতাড়ি দূত পাঠিয়ে তাঁকে যুদ্ধের ভার নিতে হুকুম দিলেন। পূর্বেকার মতো এবারও রুস্তমই ইরানের ভরসা। দুই দলের শিবির পড়ল প্রকাণ্ড একটা মাঠের দুই দিকে। একটা ছোটো পাহাড়ের উপর উঠে ভোরের আবছা আলোয় সোহরাব দেখলে, সারি সারি ইরানী শিবির দাঁড়িয়ে আছে যেন কতকগুলো থমকে-যাওয়া সমুদ্রের ঢেউ। সোহরাব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল, কী ক'রে তার বাবার সঙ্গে সাক্ষাৎ হতে পারে। মনে মনে একটা উপায়ও ঠিক হল। ভাবল, যদি দ্বন্দ্বযুদ্ধে জয়পরাজয়ের মীমাংসা হয়ে যায় তবে অনর্থক প্রাণনাশ তো হয়ই না, রুস্তমেরও দেখা মেলে।

সোহরাবের প্রস্তাব নিয়ে তুরানী দূত যখন ইরানী শিবিরে এল, রুস্তম খুব হেসে বললেন, "বালকের তো স্পর্ধা কম নয়! একে উচিতমত শিক্ষা দিতে হবে।" ঠিক হল ইরানীদের হয়ে তিনিই সোহরাবের সঙ্গে লড়বেন, কিন্তু পরিচয় গোপন রেখে।

দুই শিবিরের মাঝখানে একটা নির্জন জায়গায় দুইজনে ঘোড়া ছুটিয়ে এলেন। কেউ ধারে কাছে নেই, কেবল সোহরাব ও রুস্তম। সোহরাবের কচি মুখ দেখে

রুস্তমের যেন মায়া হল; বললেন, "বালক, এই অল্প বয়সে মরবার সাধ কেন। জান, এই হাতে অনেক শত্রুর নিপাত করেছি।" সোহরাব উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করল, আপনিই কি দিগ্‌বিজয়ী বীর রুস্তম।" তিনি যে একটি সামান্য বালকের সঙ্গে লড়তে নেমেছেন, এই লজ্জা ঢাকবার জন্য রুস্তম সত্য গোপন করে বললেন, "ভীরুর

মতো ভয় পেয়ো না। আমি রুস্তম নই, তিনি আছেন জাবুলিস্তানে। আমি তাঁর সামান্য চাকর মাত্র।"

শুরু হল যুদ্ধ। দুজনেরই বর্শা ভেঙে চুরমার, তলোয়ার গেল খান্‌খান্ হয়ে; ঘামে ও রক্তে তাদের সমস্ত শরীর ভিজে গেল। সূর্য যখন ডোবে-ডোবে তখন সোহরাবের গদার ঘায়ে রুস্তম কাবু হয়ে পড়ে গেলেন। রুস্তমের প্রাণ তার হাতে,

কিন্তু পরাজিত শত্রুকে প্রাণভিক্ষা দিয়ে সোহরাব বললে, "আজকের মতো সন্ধি, কাল আবার হারজিত পরখ হবে।" মাথা নিচু ক'রে রুস্তম শিবিরে ফিরে এলেন। এ দিকে সোহরাব অনেক রাত অবধি একা তার তাঁবুতে বসে মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে লাগল, রুস্তম কি তবে জাবুলিস্তানেই থেকে গেলেন।

পরের দিন কি জানি কেন তার মন কেবলই বলতে লাগল, এই ইরানী আর কেউ নয়, তারই বাবা। আবার সে আগ্রহ ক'রে জিজ্ঞেস করল, "আপনি কি সত্যিই রুস্তম নন।" রুস্তম আগের দিনের মতো টিটকারি দিয়ে সোহরাবকে মল্লযুদ্ধে ডাকলেন। ঠাট্টা শুনে সোহরাবের রক্ত গেল গরম হয়ে, শরীরে যেন তার পাগলা হাতির শক্তি এল। বালির উপর রুস্তমকে আছড়ে ফেলে সে তাঁর বুকের উপর চেপে বসল। খাপ থেকে সে তলোয়ার বের করছে এমন সময় রুস্তম ব'লে উঠলেন, "পর পর দুইবার শত্রুকে ধরাশায়ী করতে না পারলে তার প্রাণ নেওয়া যায় না— ইরানদেশের এই নিয়ম।" আজও সোহরাব সন্ধি করল।

তৃতীয় দিন। যুদ্ধ আবার শুরু হল। আজ প্রথম থেকেই সোহরাব কেমন যেন আনমনা হয়ে ছিল, সুবিধা বুঝে রুস্তম কোনোরকমে তাকে মাটিতে ফেলেই সোহরাবের বুকে তীক্ষ্ণ ছোরাটা বসিয়ে দিলেন। কোথায় রইল ইরানদেশের নিয়ম। সোহরাব যন্ত্রণায় কেঁদে উঠল, "হায় রে, এ জন্মে আর বাবার সাথে দেখা হল না!" রুস্তমকে শাসিয়ে সে বলল, "শোনো ইরানী, যদি তুমি মাছের মতো সমুদ্রের গভীর তলায় লুকিয়ে থাক', আকাশের তারার মতো যদি নাগালের বাইরেও চলে যাও— তবু আমার বাবার হাত থেকে তোমার রক্ষা নেই।"

রুস্তম জিজ্ঞেস করলেন, "কে তোমার বাবা।" জবাব এল, "আমার বাবা ভুবনবিজয়ী বীর রুস্তম, আর আমার মা হলেন সামেনগানের রাজার মেয়ে।" রুস্তম নিমেষের মধ্যে অন্ধকার দেখলেন; বললেন, "কই, তাহমিনের তো ছেলে হয় নি। আমি রুস্তম, আমি জানি।" গভীর আরামে নিশ্বাস ফেলে, সোহরাব কোনো কথা না ব'লে তার ডান হাতের তাবিজটা দেখিয়ে দিল। যখন আর সন্দেহ রইল না সোহরাবকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে রুস্তম কাতর চীৎকারে কেঁদে উঠলেন। বাবার

বুকে মাথা রেখে সোহরাব শুধু বলল, "আর আমার দুঃখ নেই।"

সন্ধ্যা হয়ে আসে, যোদ্ধারা ফিরছেন না দেখে ইরানী তুরানী সৈন্যরা যুদ্ধক্ষেত্রে ভিড় ক'রে এল। যে গভীর শোকের দৃশ্য তারা দেখল তার কাছে যেন তাদের এত কালের ঝগড়াবিবাদ তুচ্ছ মনে হল। তারা দেখল, বীর ছেলের প্রাণহীন রক্তাক্ত দেহ কোলে নিয়ে, রুস্তম পাথরের মূর্তির মতো স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন। সূর্য তখন সবে অস্ত গেছে, আকাশের রঙ লাল।

গান

ঐই তো ভালো লেগেছিল   আলোর নাচন পাতায় পাতায়,
শালের বনে খেপা হাওয়া   এই তো আমার মনকে মাতায়।
রাঙা মাটির রাস্তা বেয়ে   হাটের পথিক চলে ধেয়ে,
ছোটো মেয়ে ধুলায় ব'সে   খেলার ডালি একলা সাজায়—
সামনে চেয়ে এই যা দেখি   চোখে আমার বীণা বাজায়॥

আমার এ যে বাঁশের বাঁশি,   মাঠের সুরে আমার সাধন,
আমার মনকে বেঁধেছে রে   এই ধরণীর মাটির বাঁধন।
নীল আকাশের আলোর ধারা   পান করেছে নতুন যারা
সেই ছেলেদের চোখের চাওয়া   নিয়েছি মোর দু চোখ পুরে,
আমার বীণায় সুর বেঁধেছি   ওদের কচি গলার সুরে॥

দূরে যাবার খেয়াল হলে   সবাই মোরে ঘিরে থামায়,
গাঁয়ের আকাশ সজনে-ফুলের   হাতছানিতে ডাকে আমায়।
ফুরায় নি ভাই, কাছের সুধা,   নাই যে রে তাই দূরের ক্ষুধা—
এই-যে এ-সব ছোটোখাটো   পাই নি এদের কূল-কিনারা,
তুচ্ছ দিনের গানের পালা   আজো আমার হয় নি সারা॥

লাগল ভালো, মন ভোলালো   এই কথাটাই গেয়ে বেড়াই;
দিনে রাতে সময় কোথা,   কাজের কথা তাই তো এড়াই।
মজেছে মন, মজল আঁখি,   মিথ্যা আমায় ডাকাডাকি—
ওদের কাছে অনেক আশা,   ওরা করুক অনেক জড়ো;
আমি কেবল গেয়ে বেড়াই,   চাই নে হতে আরো বড়ো॥

শান্তিনিকেতন

আমাদের দেশে প্রাচীন কালে ছাত্রেরা অধ্যয়নের জন্য যেত ঋষির আশ্রমে। লোকালয় থেকে বহু দূরে বনের গভীরে তপোবন, তারই নির্জন ছায়ায় গুরু পরম যত্নে শিষ্যদের শিক্ষা দিতেন ব্রহ্মবিদ্যা, মানবজীবনের যা শ্রেষ্ঠ বিদ্যা। গুরুপত্নী শিষ্যদের প্রতিপালন করতেন মায়ের স্নেহে। পর্ণকুটিরে ছিল সকলের বাস, সহজ সরল ছিল জীবন। নিজের কাজকর্ম শিষ্যদের নিজেদেরই করতে হত, ফলে ধনী দরিদ্র, ছোটো বড়ো, এ-সব মিথ্যাজ্ঞান জন্মাত না। গুরুর প্রতি ছিল তাদের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা, সতেজ সবল ছিল দেহ, অন্তর স্বাধীন ও উদার।

সে যুগও আর নেই, সে তপোবনও আজ লুপ্ত হয়েছে। তবু কেন শান্তিনিকেতনকে লোকে আশ্রম বলে। তোমরা হয়তো অবাক হবে শুনে, যে, এই শান্তিনিকেতনেরও গোড়াপত্তন ক'রে দিয়েছেন এক ঋষি। ভাবছ, এ যুগে আবার ঋষি এলেন কী ক'রে। অথচ রবীন্দ্রনাথের বাবা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে এই যুগেই লোকে নাম দিয়েছিল 'মহর্ষি', এমন নিষ্ঠা ছিল তাঁর সাধনার। রাজার সমান ধনীর ঘরে জন্মেও সর্বস্ব ত্যাগ করে তিনি সাধকের জীবন গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর জীবনের মন্ত্রই ছিল, 'ঈশ্বর নিজের হাতে যা দান করেছেন তাই গ্রহণ করো, অন্যের ধনে লোভ কোরো না।'

সে আজ প্রায় আশি বছর আগেকার কথা। মহর্ষি একদিন চলেছেন বোলপুর স্টেশনে নেমে রায়পুরে সিংহবাড়ির নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে। রোদে পোড়া ধু ধু তেপান্তর মাঠ। পথে ডাঙা জমির বুকে এক জায়গায় দুটিমাত্র ছাতিম গাছ। তারই ছায়ায় দাঁড়িয়ে তিনি একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন দূর দিগন্তের দিকে। সমুদ্রের মতো উদার মাঠের শিয়রে এসে মিশেছে অনন্ত আকাশ। যত দূর দৃষ্টি যায় কোনো বাধা নেই। মুহূর্তের মধ্যে তাঁর প্রাণ ভ'রে উঠল আরামে, মন আনন্দে, আত্মা গভীর শান্তিতে। এই ছাতিমের ছায়াটিকে তাঁর নির্জন সাধনার উপযুক্ত জায়গা ব'লে তিনি সেদিন বেছে নিলেন।

কিন্তু স্থানটি বড়ো বেশি নির্জন। নিরাপদ হবে তো এখানে বাস করা? জানা

গেল, একদল ডাকাতের খুনে'র আড্ডা এই ছাতিমতলায়। মাটি খুঁড়ে এমন-কি, মড়ার খুলিও অনেক পাওয়া গেল। মহর্ষি কিন্তু সমস্ত বাধাকে তুচ্ছ জ্ঞান করলেন। বাইরে থেকে আনিয়ে ঢাললেন উর্বর মাটি এই মরুভূমির বুকে। বহু টাকা ব্যয় করে একা নিজের উৎসাহে ও চেষ্টায় নানা জাতের গাছপালা লাগালেন। আম্রকুঞ্জ, শালবীথি, আমলকীবীথি, দেবদারুবীথি, শিরিষ-বকুলের কুঞ্জ— সমস্ত মিলে গড়ে উঠল যেন ছায়া-ঘেরা এক মরূদ্যান। তৈরি হল পাকা ইমারত, কাঁচের সুন্দর এক মন্দির। ডাকাতের দল একে একে হল অন্তর্ধান, শোনা যায় তাদের কয়েকজন নাকি ডাকাতি ছেড়ে মহর্ষির সেবায় লেগেছিল। এত কাল যে জায়গা ছিল বিষম ভয়ের, শেষে তাই হল পরম আশ্রয়ের স্থান— আশ্রম। মহর্ষি এর নাম দিলেন 'শান্তিনিকেতন'। নিরালায় শান্তিতে ব'সে যাঁরা সাধনা করবেন তাঁদের সকলের তপস্যার জন্য তিনি উৎসর্গ করে গেলেন এই তপোবন। আশ্রমের প্রথম জন্মদিনের বোবা সাক্ষী পুরোনো সেই ছাতিম গাছ দুটি আজও বেঁচে রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ যখন তোমাদেরই মতো বালকমাত্র তারও পূর্বে থেকে কত সন্ধ্যায় না মহর্ষি এই গাছের তলায় ব'সে উপাসনা করেছেন। আশ্রমের পুবে পুকুরপাড়ে কাঁকরের যে পাহাড় তার উপরে ব'সে সূর্যোদয় দেখতে দেখতে তিনি করতেন তাঁর ভোরের উপাসনা। ছেলেবেলায় রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে যেবার প্রথম আসেন— বয়স এগারো কি বারো— তখন খোয়াই থেকে কত নুড়িই না তিনি কুড়িয়েছেন এই পাহাড়টিকে সাজাবার খেলায়। আগাগোড়া এই আশ্রমটিকে একদিন তাঁকেই যে নতুন ছাঁচে সাজাতে হবে সে কথা তখন কি আর তিনি জানতেন।

একে একে কাটল প্রায় ত্রিশ বছর। এগারো বছরের সেই বালক ক্রমে হলেন চল্লিশ বছরের রবীন্দ্রনাথ। এখন তিনি পদ্মা নদীর নির্জন তীরে বজরায় বাসা বেঁধে গ্রামে গ্রামে নিজের কাজকর্ম দেখেন, পড়াশুনা করেন, আর অনর্গল কবিতা লেখেন। দেশজোড়া তাঁর খ্যাতি, সুখের সীমা নেই। এমন সময়ে প্রাণে তাঁর জাগল অসহ্য অতৃপ্তি, স্বদেশের দুর্দশার কথা চিন্তা ক'রে। অন্নের অভাবে, বিদ্যার অভাবে দেহে মনে দুর্বল দেশের লোকেরা। তাদের শক্তি নেই, সাহস নেই, উঁচ কোনো আশা নেই

প্রাণে। শহরের পাঁচিল-ঘেরা ইস্কুলে শাসনের চাপে ছেলেবেলা থেকেই তাদের হৃদয় মন সংকীর্ণ হয়ে শুকিয়ে যায়, যেমন শুকিয়ে ছোটো হয়ে যায় বন্ধ ঘরের কোণে টবের চারাগাছ। সেখানে বিদ্যা যা তারা লাভ করে তা পরীক্ষা পাস-করানো পুঁথির বিদ্যা, সে যেন ভেজাল-মেশানো হোটেলের অন্ন। মায়ের নিজের হাতের অন্নে যেমন বালকের দেহ পুষ্ট হয়, তার হৃদয় ও মন তেমনি পুষ্ট হয় প্রকৃতির কোলে মুক্তি লাভ করলে, পুঁথির বিদ্যাকে প্রাণের ক'রে নেবার স্বাধীন সুযোগ পেলে। রবীন্দ্রনাথ তাই সংকল্প করলেন, দেশের বালকদের মনের উপবাস তিনি দূর করবেন। শান্তি-নিকেতনের মুক্ত আকাশের নীচে, গাছপালার সবুজ ছায়ায়, সরল সংযত তপোবনের আবহাওয়ার মধ্যে বিদ্যালয় স্থাপন করার এই সংকল্প তিনি মহর্ষিকে জানালেন। মহর্ষি পরম উৎসাহে সম্মতি দিলেন।

১৩০৮ সালের ৭ই পৌষ, মহর্ষির দীক্ষাদিনের উৎসব। সেই শুভদিনে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন আশ্রমে 'ব্রহ্মবিদ্যালয়' স্থাপন করলেন। মাত্র পাঁচটি বালক ছাত্র, এবং দুজন মাত্র শিক্ষক। অতি প্রত্যুষে গ্রন্থাগারের মাঝের ঘরে সকলে সমবেত হলেন রাঙা চেলি ও উত্তরীয় প'রে। গায়ত্রীমন্ত্র উচ্চারণ ক'রে ছাত্রেরা ব্রহ্মচারী হবার দীক্ষা নিল, যেমন নিত শিষ্যেরা প্রাচীন কালে গুরুর আশ্রমে। বিদ্যালয়-পরিচালনার ভার নিলেন স্বদেশভক্ত তেজস্বী এক ব্রহ্মচারী, নাম তাঁর ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। বড়ো হয়ে বাংলায় স্বদেশী আন্দোলনের ইতিহাস যখন পড়বে তখন এঁর কথা আরো ভালো ক'রে তোমরা জানতে পারবে; আজ আর ইনি বেঁচে নেই। আশ্রমের প্রথম পাঁচটি ছাত্রের একজন ছিলেন রবীন্দ্রনাথের পুত্র রথীন্দ্রনাথ। প্রথম যুগের আর-এক ছাত্র স্বর্গীয় সন্তোষচন্দ্র মজুমদার। ছোটো ছেলেদের তিনি খুব ভালোবাসতেন ব'লে শান্তি-নিকেতনের শিশুদের ঘরের 'সন্তোষালয়' নামটি তাঁরই স্মরণে দেওয়া হয়েছে।

আরাম ও সুখভোগকে যথাসম্ভব সরল ক'রে গুরুসেবা, অতিথিসেবা, নিয়মিত উপাসনা ও অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে ছাত্রদের আশ্রমজীবন শুরু হল। জাতবিচার বা গরিবে বড়োলোকে ভেদ রাখা হল না। গুরুশিষ্যে মিলে যেন একটিই পরিবার। ছেলেরা সেকালে রান্না ছাড়া নিজেদের সব কাজ নিজেরাই করত। ছাতা জুতো তারা

মোটেও ব্যবহার করত না। পোশাক ছিল যত দূর সম্ভব সাদাসিধে। হাল-ফ্যাশনের জামার বালাই ছিল না বললেই চলে। প্রত্যুষে সূর্যোদয়ের পূর্বে ঘুম থেকে উঠে তারা স্নান করত; তার পরে চেলি প'রে তারা উপাসনায় বসত। মন শান্ত হলে মুক্ত প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে ছাত্রে অধ্যাপকে মিলে বেদগান করতেন। শুদ্ধ শুচি হয়ে ছাত্রেরা এর পর অধ্যাপকদের প্রণাম করে পুঁথিপত্র নিয়ে গাছের তলে গিয়ে বসত। তোমাদেরই মতো তারাও ইংরেজি বাংলা অঙ্ক সংস্কৃত ইতিহাস ভূগোল, এমন-কি, বিজ্ঞানও অধ্যয়ন করত। রবীন্দ্রনাথ নিজে মুখে মুখে কথাবার্তা বলে তাদের ইংরেজি ও বাংলা শেখাতেন। কখনো কখনো বিজ্ঞানও শেখাতেন।

শান্তিনিকেতনের ক্লাস

'ইংরেজি-সোপান' ইত্যাদি ছোটোদের পড়ার বইয়ের অনেকগুলিই তাঁর এই সময়ের রচনা। সে-সব বই রবীন্দ্রনাথ বিশেষ ক'রে আশ্রমের ছাত্রদের জন্যেই লিখেছিলেন।

স্বর্গীয় জগদানন্দ রায় ছেলেদের গাছপালা, পোকামাকড়, গ্রহনক্ষত্রের খবর দিতেন। তারা চোখ খুলে আশে-পাশে নানা জিনিস ভালো ক'রে খুঁটিয়ে দেখতে শিখত। এমনি করে দেহের সঙ্গে সঙ্গে ছেলেদের মনও মানুষ হয়ে উঠত, তাদের বুদ্ধি প্রখর এবং হৃদয় উদার হত।

বিদ্যালয় আরম্ভের তৃতীয়বছরে এলেন কবি সতীশচন্দ্র রায়। তোমরা তাঁর লেখা 'গুরুদক্ষিণা' বইটিতে পরিচয় পাবে আশ্রমের আদর্শকে তিনি কত শ্রদ্ধা করতেন। আশ্রমে তখন ঘরবাড়ি ছিল অল্পই। লাইব্রেরি-বাড়ি আর ছেলেদের জন্য প্রাক্‌কুটিরের লম্বা মাটির ঘর। ছাত্রে অধ্যাপকে একসঙ্গে বাস করতেন।
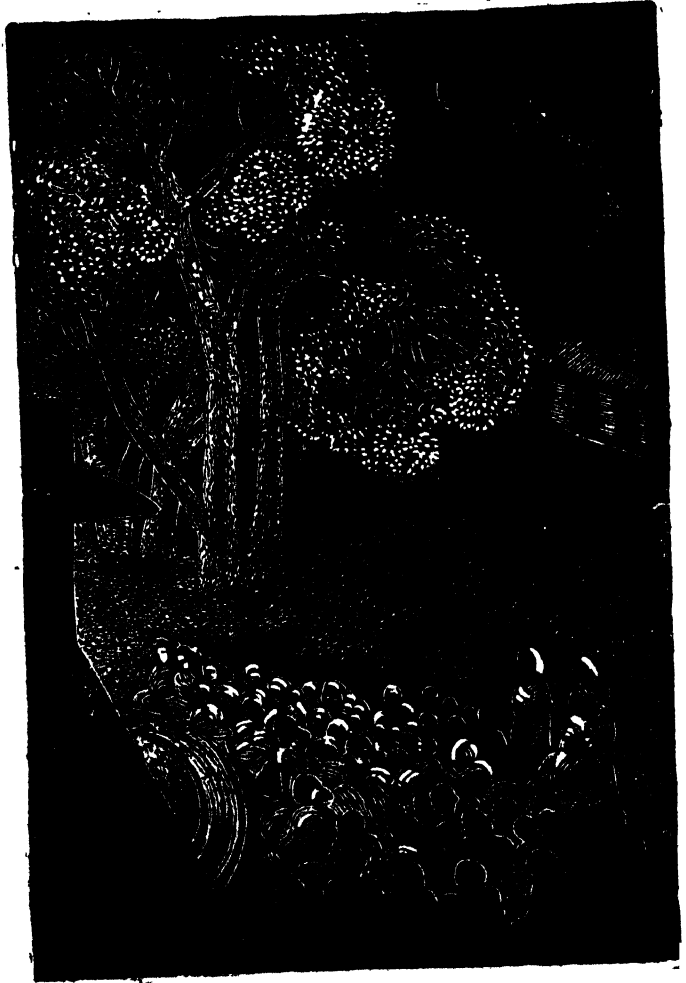
শান্তিনিকেতনে ছেলেমেয়েদের সাহিত্যসভা

জমিদার-বাড়ির ছেলে হয়েও সতীশচন্দ্র আশ্রমের এই কষ্টের জীবন বরণ করলেন পরম আনন্দে। আশা ও উৎসাহ পেতেন এই ভেবে যে, শান্তিনিকেতনে

দেশের ছেলেরা দেশের আদর্শে সত্যিকারের মানুষ হবে, মন তাদের অনেক বড়ো হবে। অকালে মাত্র একুশ বছর বয়সে তিনি এই আশ্রমেই মারা গেলেন। পরে তাঁরই স্মরণে তৈরি হয়েছিল 'সতীশকুটির'। তাঁর 'গুরুদক্ষিণা'য় আশ্রমের সকল ছেলেমেয়েদের তিনি কত বড়ো আশীর্বাদ করে গেছেন একবার শোনো— 'আমাদের আশীর্বাদ মেঘে মিশে বৃষ্টিরূপে তোমাদের মাথায় পড়ুক, সূর্যকিরণে মিলে প্রতিদিন প্রভাতে তোমাদের চক্ষে এসে আবির্ভূত হোক, এবং তোমাদের হৃদয়ের মধ্যে নিবিড় শান্তি বহন ক'রে বায়ুর সঙ্গে সঞ্চারিত হতে থাকুক। তোমরা সকলে কৃতী হও, শক্তিবান্ হও, নির্ভয় হও, নির্মল হও, ব্রহ্মনিষ্ঠ হয়ে আত্মাকে সার্থক করো।' রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধার তুলনা হয় না।

একে একে আরো কত কর্মী এলেন এই আশ্রমের কাজে সাহায্য করতে। ছাত্রের দলও ধীরে ধীরে নানা প্রদেশ থেকে আসতে লাগল। টাকার কী টানাটানির মধ্যেই না রবীন্দ্রনাথের তখন দিন কেটেছে। বিদ্যাদানকে ব্যাবসা ক'রে তুলতে চান নি ব'লে প্রথম যুগে ছাত্রদের কাছে কোনো বেতন নেওয়া হত না। পরে বাধ্য হয়ে টাকা নেবার ব্যবস্থা হল। আশ্রমবিদ্যালয়কে কবির খেয়াল ব'লে অনেকে বিদ্রূপও করেছে। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু তিলমাত্র নিরুৎসাহ হন নি, এত দৃঢ় ছিল তাঁর বিশ্বাস বিদ্যাচর্চার এই নতুন ব্যবস্থায়। এত অনটনের মধ্যেও অতিথির প্রতি উপযুক্ত সমাদরের অভাব আশ্রমে কোনোদিন হয় নি। ১৩২১ সালে মহাত্মা গান্ধী তাঁর ইস্কুলের ছাত্রদের নিয়ে দক্ষিণ-আফ্রিকা থেকে যখন ভারতে ফিরলেন, শান্তিনিকেতন আশ্রমই হল তাঁদের প্রথম আশ্রয়। তাঁর উৎসাহে ছাত্রেরা সে সময়ে রান্নার কাজও আরম্ভ করেছিল। আশ্রমে কিছুকাল চাকরের কোনো দরকারই হয় নি। ২৬শে ফাল্গুন 'গান্ধী-দিবসে' নিজেদের সমস্ত কাজ নিজেরা ক'রে আজও শান্তিনিকেতনে ছাত্রছাত্রীরা গান্ধীজির আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করে।

এই অভাবের সময়েও ছেলেদের শিক্ষা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ সর্বদা জ
হয়ে আছেন। প্রতি বুধবার ভোরে অধ্যাপক ও ছাত্রদের নিয়ে মন্দি

করলেন। নিয়মিত আলোচনা ও উপদেশের সাহায্যে সকলের প্রাণে উৎসাহ এনে দিলেন। আনন্দের আয়োজনও প্রচুর হল। ঋতুর পরে নতুন ঋতু আসছে, আর রবীন্দ্রনাথ নতুন নতুন নাটক ও গান লিখে উৎসবের আয়োজন করছেন। বর্ষায় শরতে বসন্তে প্রকৃতির প্রাণের যে আনন্দ, ছেলেদের প্রাণে প্রাণে তা প্রবেশ করাতে না পারলে তাঁর মন কি তৃপ্তি পায়। 'ফাল্গুনী', 'শারদোৎসব', 'বর্ষামঙ্গল'-এর অজস্র গান ছেলেদের সবার গলায়। বনের পাখির মতো ভোরের বৈতালিক থেকে রাত্রের বৈতালিক পর্যন্ত সর্বদা অফুরন্ত আনন্দে তারা সুর ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে আশ্রমের আকাশে-বাতাসে। তাদের পাশে বুড়োদেরও মুখ বুজে গম্ভীর হয়ে থাকা দায় হল। কর্তব্যের সঙ্গে আনন্দ মিশিয়ে ছেলেরা যেন সকল কাজ সহজে করবার এক অতি আশ্চর্য শক্তি লাভ করেছে। এ কাজে দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ছাত্রদের 'দিনূদা' ছিলেন রবীন্দ্রনাথের প্রধান সহায়।

শান্তিনিকেতনে ছাত্রছাত্রীরা ছবি আঁকছে

প্রকৃতির সঙ্গে নিকট-পরিচয় ক্রমে পূর্ণ হল প্রতিবেশীদের পরিচয় লাভ করে। ভুবনডাঙা ও সাঁওতালগ্রামের লোকদের সঙ্গে আশ্রমের ছেলেরা সেবার মধ্য দিয়ে সম্পর্ক পাতালো। আরম্ভ হল গ্রামে [illegible]শবিদ্যালয়ের কাজ। বিকালে বা সন্ধ্যায় ছেলেদের কেউ থাকত খেলাধুলা [illegible]ভিনয় নিয়ে, আর বড়োরা কেউ যেত গ্রামের লোকেদের লেখাপড়া[illegible] তারা বিদ্যাবুদ্ধির সাহায্যে তাদের অভাবের ও দুঃখের জীবনকে

শ আনন্দের ও সুখের করে তুলতে পারে। সুহৃদ, প্রসাদ প্রভৃতি পুরোনো
ম আজও জড়িয়ে আছে শান্তিনিকেতনের আশেপাশের গ্রামের কাজে।
অনেক লোকের মনে আজও তাদের স্মৃতি তাজা রয়েছে।
মের সঙ্গে সম্পর্ক ক্রমেই আরো নিবিড় হল। দেশের চাষবাসের ব্যাপারে
উৎসাহ দেবার জন্যে ১৩১৯ সালে রবীন্দ্রনাথ সুরুলের কুঠিবাড়ি ও সেই-
ঘা জমি কিনলেন। ছাত্রদের চাষ-আবাদের ও পশুপালনের ছোটো-
চেষ্টা থেকেই ক্রমে নানা আয়োজনে পরিণতি লাভ করল শ্রীনিকেতন

সমবেত উপাসনা

ভাগ। মিঃ এল্‌ম্‌হার্‌স্ট্‌ নামে আশ্রমের বিদেশী এক বন্ধু হন এ কাজে
সহায়।
৩২০ সালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর গীতাঞ্জলির জন্যে সুইডেন থেকে জগদ্‌বিখ্যা
ল পুরস্কার পেলেন। সেই এক লাখ কুড়ি হাজার টাকা তিনি যখন আশ্রমের
দান করলেন, এই অভাবের সংসারে নতুন সাড়া জাগল। দেশে-বিদেশে
নাথের নামের সঙ্গে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের নামও প্রচার হয়ে গেল এক
য়। এলেন ইংরেজ কর্মী পিয়ার্সন ও এণ্ড্রুজ সাগর পার হয়ে, এই আশ্রমের
জীবন উৎসর্গ করতে। শিশুর মতো সরল মন নিয়ে এঁরা আশ্রমের
সঙ্গে নিকটতম আত্মীয় হয়ে মিশে গেলেন। পিয়ার্সনকে সাঁওতালরা
তাদের আপনার লোক বলে জানত। সাঁওতালগ্রামের ইউক্যালিপ্‌টাস্‌ গাছটি

তাঁরই হাতের লাগানো— এখানকার মাটিতে প্রথম বিদেশী গাছ।

একটি অতি ছোটো বীজ থেকে অঙ্কুর বেরিয়ে ক্রমে তা চারি দি ছড়িয়ে বিরাট গাছ হয়, পিপাসিত শ্রান্ত পথিককে ছায়া দেবার শান্তিনিকেতনের আশ্রমবিদ্যালয় তেমনি 'বিশ্বভারতী' নাম নিয়ে এক পরিণত হয়েছে। এও যেন বিরাট এক বনস্পতি, আর অসংখ্য ডালপালা বিপুল ছায়া মেলে দাঁড়িয়ে আছে। বিশ্বের যেখানে যত জ্ঞানপিপাসু বিদ্যার বা জ্ঞানের চর্চা করতে চান, তাঁরা শান্তির নীড় বাঁধছেন এর ভারতের জ্ঞানের দান শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁরা গ্রহণ করছেন, আর আমা দিয়ে যাচ্ছেন তাঁদের দেশের যা নূতনতর জ্ঞান। এইরকম দে দিয়েই একদিন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ পরস্পরকে ভাই বলে জানতে শিখ